রংপুরের রংধনু

ফরিদুর রেজা সাগর

গতকাল রাতে ছোটকাকু একটা কথা বলেছিল- আজকাল আমাদের জীবনে অনেক বিপ্লব নীরবে হয়ে যাচ্ছে। ছোটকাকু কি ভেবে কথাটা বলেছিলেন জানি না। কিন্তু এই মুহূর্তে কালাম হকার নতুন একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা দিয়ে বলল,

এই পত্রিকাটা নতুন বের হুয়া।

তখন মনে হলো স্যাটেলাইট টেলিভিশনে হিন্দি চ্যানেলগুলোর জন্য আজকাল অনেকের কথার মধ্যে হিন্দি শব্দ ঢুকে গেছে। সেদিন রুনু খালাকেও বলতে শুনেছিলাম, তার ছয় মাসের ছোট ছেলে কাঁদলে তাকে নাকি স্টার প্লাস বা জিটিভি চালিয়ে হিন্দি অনুষ্ঠান দেখালে কান্না থেমে যায়। দশ বছর আগে যখন জিটিভি শুরু হয়েছিল তখন জিটিভির প্রধান বলেছিল, নমস্তেজী থেকে তারা 'জি' শব্দটা নিয়েছে। আর এখন বলছে জিও জি ভারকে- সেখান থেকে নাকি তারা 'জি' শব্দটা নিয়েছে। তবে-

ছয় মাসের শিশু আর বত্রিশ বছরের কালাম হকার কি যে মজা পায় হিন্দি কথায়! কালামের দেয়া পত্রিকাটা হাতে নিয়ে পাতা উল্টাবো, তখনই আড়াল থেকে মায়ের কথা শুনতে পেলাম। মা কাজের লোককে বলছে, একটা সিএনজি ডেকে দিতে। এই আরেকটা নতুন শব্দ।

সিএনজি মানে হলো কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পেট্রোলের অভাব দেখা দিলে ইটালিতে প্রথম গাড়িতে সিএনজি ব্যবহার করা হয়। আর এর ঠিক ৫০ বছর পর ১৯৮২তে বাংলাদেশে প্রথম সিএনজি ব্যবহার শুরু হয়।

আমার মা এসব কিছুই জানেন না। অথচ শুধু আমার মায়ের কথা বলি কেন, আজকাল ঢাকা শহরের অনেকে সিএনজি বলতে ট্যাক্সিক্যাবকে বোঝে। কেউ কেউ আবার নতুন সিএনজি চালিত বেবিট্যাক্সিকেও সিএনজি বলে। একেবারে ভুল একটা শব্দ কিভাবে বাংলা ভাষায় ঢুকে যাচ্ছে কেউ বোধহয় সেটা ভাবছেও না। অবশ্য ভাবার কথাও নয়। কারণ বাংলা ভাষার উৎপত্তি কিন্ত আমাদের বাংলাদেশে নয়। এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও নয়। বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় নেপালে। সেই নিদর্শনের নমুনা হচ্ছে 'চর্যাপদ'। সুতরাং নেপালে পাওয়া বাংলা ভাষা যখন আমাদের বাংলা ভাষা তখন সেখানে হোন্ডা (যদিও এটা একটা কোম্পানির নাম) মানে মোটরসাইকেল কিংবা জিপ (এটিও একটি কোম্পানির নাম) মানে জিপ গাড়ি এসব শব্দ ঢুকে গেলে কারই বা কি বলার আছে!

ছোটকাকু, আমি জানি না, এই যে ভাষার মধ্যে নীরব বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে সেসব কথা ভেবে নীরব বিপ্লবের কথা বলেছিলেন কি না! এই সময় মোবাইল ফোনটা টুক করে বেজে উঠল। এই শব্দটা মানে ফোন আসা নয়, ম্যাসেজ আসা। ফোনে কথা বললে বিল বেশি আসে তাই সবাই এখন ম্যাসেজ দেয়। ছোটকাকুও একটা ম্যাসেজ দিয়েছে CUD NT GT U-এরপর একটা মুখের ছবি। তারপর লেখা। CUMING। প্রথম মনে হতে পারে এটা একটা সাংকেতিক কথা। কিন্তু আজকাল আমি এই সমস্ত SMS-এ অভ্যস্ত হয়ে গেছি। শুধু বাংলা ভাষার কথা কেন বলি! ইংরেজি ভাষায় এই বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে দারুণভাবে। এখন About-কে লেখা হয় AB8, For কে 4। আর যে ম্যাসেজটা ছোটকাকু পাঠিয়েছে সেটা পুরোটা আসলে হবে Couldn't get you. অর্থাৎ ফোনে ছোটকাকু আমাকে পাচ্ছে না। হয়তো নেটওয়ার্ক ব্যস্ত থাকার কারণে। আর মুখের ছবিটা দেয়ার অর্থ তার পরিচিত কোনো লোক আসছে। বাকিটুকু আমাকে বুঝে নিতে হলো। ছোটকাকুর কোনো বন্ধু হয়তো আসবে। ছোটকাকুর আসতে দেরি হবে। সুতরাং বন্ধুকে রিসিভ করতে হবে। তারপরও ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ছোটকাকুকে ফোন করলাম। দেখলাম, ছোটকাকুর ফোনটা বন্ধ। ছোটকাকু বোধহয় কোনো মিটিংয়ে রয়েছেন।

ছোটকাকুকে ম্যাসেজ দিলাম, এসএমএস পেয়েছি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম কাজের ছেলেটা একটা স্কুটার দরজার ওপর দাঁড় করিয়েছে। সেখান থেকে চেঁচিয়ে মাকে বলছে,

সিএনজি থামানো হয়েছে।

মাও ঘর থেকে বললেন,

একটু দাঁড়াতে বলো।

আমি জানি এরপর মা আমার ঘরে আসবেন। বলবেন,

সিএনজি ধরা হয়েছে। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

ঘটনাটা তাই ঘটলো। মা এলেন, বললেন এবং বাইরে গেলেন।

আমি রিমোটটা হাতে নিয়ে টেলিভিশন অন করলাম। সিএনএন, বিবিসিতে এখনো চলছে সুনামির খবর। এই আরেকটা শব্দ। ২৬ ডিসেম্বর এশিয়ার কয়েকটা অঞ্চলে ভয়াবহ সামুদ্রিক বিপর্যয়ের পর প্রথম যখন ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা পত্রিকায় এই খবরটা দিয়েছিল তখন এই সুনামি শব্দটা ছিল না। প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল 'ভূমিকম্প' সম্পর্কিত একটি শব্দ। দু'দিন পর সিএনএনে প্রথম ব্যবহার করা হয় সুনামি। কিন্তু শব্দটা জাপানি হওয়ায় প্রথম শব্দটা ছিল 'T'. বাংলা পত্রিকা এবং টেলিভিশনে সুনামি শব্দটা ঠিকমতো লেখা হচ্ছিলো না। কয়েক দিন পর চ্যানেল আই এই শব্দটার আগে 'ৎ' ব্যবহার করেছিল। ৎ 'সুনামি' বানান সঠিক, কারণ জাপানি শব্দ হওয়ায় ইংরেজিতে যেমন 'S'-এর আগে T ব্যবহার করা হয়েছে, বাংলায় তেমন 'ৎ'। আর জাপানি ভাষায় 'সু' মানে হলো নৌবন্দর আর 'নামি' মানে ঢেউ। অর্থাৎ সমুদ্রবন্দরের ঢেউ। এই কথা টেলিভিশনে 'সুনামি' দেখতে গিয়ে মনে হলো। মনে হওয়ার কারণ : যেমন ভাষা সংক্ষিপ্ত হচ্ছে লিখতে গিয়ে, বলতে গিয়ে- তেমনি আবার অপ্রচলিত কিছু শব্দে পুরনো দিনের ব্যবহারও একই রকম আছে। কারণ সুনামি শব্দটা অনেক বছর পর মিডিয়াতে ব্যবহার করা হলো। তাই এর বানান পরিবর্তনের কথা কেউ ভাবে না। 'ৎ' দিয়ে বাংলা ভাষায় আর কোনো শব্দ শুরু হয় কি না তাও জানি না।

অবশ্য আজকাল কম্পিউটারে বাংলা বানান লেখা অনেক সহজ হয়ে গেছে। যেমন উদ্বেগ, উদ্বোধন, এই শব্দগুলোর বানান বলা খুব কঠিন কিন্তু কম্পিউটারে লিখতে গেলে এই যুক্তাক্ষরগুলো অনেক সহজ হয়ে যায়। কেউ যদি কম্পিউটারে 'উদবেগ' বা 'উদবোধন' লেখে তাহলে সেটাকে ভুল বানান বলা হয় না।

এই সময় আবার ফোনটা বেজে উঠলো। ছোটকাকুর ফোন। জানতে চাইলেন তার বন্ধু এসেছে কি না! বললাম,

এখনো আসেনি।

চলে আসবে। একটু ভালো মতো খাতির-যত্ন করো। আমার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু।

ঠিক আছে। বললাম আমি।

কিন্তু মনে মনে একটু রাগও করলাম।

ছোটকাকুর একজন বন্ধু আসবে। তাকে আমি এমনিতেই ভালোমতো রিসিভ করবো। এটাই স্বাভাবিক। ছোটকাকুর এই কথাটা আলাদা করে বলার কি আছে? যাই হোক, ছোটকাকু হয়তো জরুরি কোনো মিটিংয়ে আছেন। সেখান থেকে হয়তো খুব ফরমাল কথা বলেছেন। ঘড়ির দিকে তাকালাম। ঘড়ির কাঁটা যেন চলছেই না। টেলিভিশনের পর্দায় সুনামির খবর। সবকিছু মিলিয়ে খুব অলস কাটছে দুপুর।

টেলিভিশনটা বন্ধ করলাম। একটা বই পড়া শুরু করবো? না কম্পিউটারে বসবো? কম্পিউটারে আজকাল নানা রকম খেলা। এমনকি ফুটবল পর্যন্ত খেলা যায়!

ভাষার ক্ষেত্রে যেমন নীরব বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে- খেলাধুলার ক্ষেত্রে কি তাই হচ্ছে? যে পরিমাণ আরামে বসে নানা রকম খেলা কম্পিউটারে খেলা যায় তাতে কেউ কি আর মাঠে যাবে খেলা দেখতে কিংবা খেলতে? অবশ্য এটা ভবিষ্যতের জন্য আলোচনার বিষয় হতে পারে। কারণ ওয়ানডে ক্রিকেট টেলিভিশনে দেখানোর পর অনেকে মনে করেছিল মাঠে দর্শক কমবে। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা একেবারে উল্টো হয়েছে। মাঠে দর্শক তো কমেইনি বরং টেলিভিশনের জন্য ক্রিকেটের দর্শক বেড়েছে। বিশেষ করে মহিলা দর্শক। তাছাড়া ওয়ানডে ক্রিকেটের অনেক নিয়ম-কানুন তৈরি হয়েছে টেলিভিশনের দর্শক এবং টেলিভিশনের কথা ভেবে। অনেকে বলেন, ফুটবল খেলা এক সময় ক্রিকেটের চেয়ে অনেক জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু এই জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার

কারণ হলো টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন। ফুটবল খেলা টানা ৪৫ মিনিট সময় ধরে চলে। ফলে সেই সময় টেলিভিশনে কোনো বিজ্ঞাপন দেখানো যায় না। আর ক্রিকেটের প্রতি ওভারের মাঝখানে বিজ্ঞাপন দেখানো যায়। ফলে বিজ্ঞাপনদাতাদের কারণেই সারা পৃথিবীতে ক্রিকেটকে প্রমোট করা হচ্ছে।

আসলে বড় বড় ঘটনা সব নীরবে ঘটে যায়। ঘটার পর সাধারণ মানুষ সেটা টের পায়। জানালা দিয়ে আবার বাইরের দিকে তাকাই। ছোটকাকুর বন্ধুর এখনো দেখা নেই। কিন্তু আকাশে একটা সুন্দর রঙধনু উঠেছে। রঙধনুর কি সত্যি সত্যি সাতটা রঙ থাকে? সব সুন্দর জিনিসেরই কোনো না কোনো রহস্য থাকে। রঙধনুকে কেউ বলে রামধনু। আকাশে কেন ওঠে তার হয়তো কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু আমি ছোটবেলায় শুনেছিলাম, বৃষ্টির পরে রোদ উঠলে মাঝখানের সময়টুকু রঙধনু দেখা যায়। কিন্তু আজ সকাল থেকে একটুও বৃষ্টি হয়নি। অথচ আকাশে রঙধনু উঠেছে। কি কারণে কে জানে! কিন্তু এই রঙধনু দেখতে দেখতে আমার একেবারও মনে হয়নি, কয়েক দিনের মধ্যেই ঢাকার আকাশে নয়, রংপুরের আকাশে কি এক রহস্যময় ঘটনার সঙ্গে আবার এই রঙধনুর দেখা পাব।

দুই.

কিছু কিছু ব্যাপার রয়েছে যা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন। আবার এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেগুলো চোখে দেখা যাচ্ছে তারপরও পুরো ব্যাপারটা বুঝতে হয় অনুভবে। কিন্তু আমার সামনে এখন যে ছবিগুলো রয়েছে সেগুলো দেখার পর যেমন আমার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে, তেমনি বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে, সত্যি সত্যি ছবিগুলো আমার চোখের সামনে রয়েছে কি না!

ছোটকাকু ফোনে বলেছিলেন তার বন্ধুকে একটু খাতির করার জন্যে। ফোনে এই কথা শুনে ছোটকাকুর ওপর রাগ করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আমার সামনে ছোটকাকুর যে বন্ধুটি বসে আছেন তিনি আসলে ছোটকাকুর সাধারণ কোনো বন্ধু নন।

গত কয়েক বছরে ছোটকাকুর নানা রকম বুদ্ধির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি অবাক হয়ে দেখেছি, ছোটকাকু কতো ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশেছেন। সেলুনের সাধারণ নাপিত থেকে শুরু করে জার্মানি থেকে কঠিন বিষয়ে পিএইচডি করে এসেছেন এমন অনেক বন্ধু রয়েছেন ছোটকাকুর। আর ছোটকাকু তাদের এমন একজন বন্ধু, যে কোনো বিষয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে যেতে পারেন ঘন্টার পর ঘন্টা। এসব আমার জানা থাকার পরও আজ ছোটকাকুর যে বন্ধু কিছুক্ষণ আগে আমাদের বাসায় এসেছেন তার জন্য একটা আলাদা শ্রদ্ধা-ভক্তি সহজেই আমার মতো যে কারো মনে জন্মাবে।

অথচ ভদ্রলোক আসবার পর আমি প্রচন্ড বিরক্ত হচ্ছিলাম তার আসার দেরি দেখে। একদিকে ছোটকাকু মেসেজ দিয়ে রেখেছে- ভদ্রলোককে রিসিভ করার জন্য। অন্যদিকে ভদ্রলোকের আসতে দেরি হচ্ছে । ফলে ভদ্রলোকের ওপর যথেষ্ট রাগ হচ্ছিলো। কারণ আমি বাইরেও যেতে পারছিলাম না, আবার অন্য কাজেও মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। এরই মধ্যে বেলের আওয়াজ শুনে ভাবলাম, ভদ্রলোক বোধহয় এসেছেন। দরজা খুলে দেখি ছোটকাকু ফিরে এসেছেন। বললেন,

- কি আখতার আহমেদ চৌধুরী এখনো আসেননি?

- আখতার আহমেদ চৌধুরী!

- আরে ঐ যে আমার বন্ধু।

- তুমি যে আজকাল কাকে বন্ধু বলো না!

- কেন?

- তোমার বন্ধু হলে সময় ঠিক রেখে এতোক্ষণে চলে আসা উচিত ছিল না! আমি কখন থেকে তার জন্য অপেক্ষা করছি।

- আসলে ভুলটা আমারই।

- মানে?

- আখতার আহমেদ চৌধুরী ফোনে আমাকে জানিয়েছিলেন তার আসতে একটু দেরি হবে। ব্যস্ততার কারণে আমি ফোন করে তোমাকে তা জানাইনি।

- তোমার বন্ধুরা কখনো কোনো দোষ করতে পারে না। তুমি তাদের দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে নাও। এটা তেমনই এক ঘটনা।

- আরে তা নয়। সত্যি সত্যি আখতার সাহেব ফোন করে সেটা জানিয়েছে। আর ঐ যে বাইরে মোটরসাইকেলের যে আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছো, ঐ আওয়াজই বলে দিচ্ছে এখনই বেল বাজবে এবং প্রবেশ করবে আখতার আহমেদ চৌধুরী।

ছোটকাকুর অনুমান খুব কমই ভুল হয়। সুতরাং বেল বাজার শব্দ শোনার আগেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজা খুলতেই যে ভদ্রলোককে দেখলাম, মনে মনে সে রকম চেহারা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ভেবেছিলাম ছোটকাকুর বন্ধু। বিশেষ যত্ন নিতে হবে। দু'বার ফোন করে যিনি আগমনের সময় পাল্টেছেন তিনি স্যুট কোট (এই আরেকটা বাংলা ভাষায় ভুল ব্যবহৃত শব্দ। স্যুট মানেই কোট এবং প্যান্ট) পরা না থাকলেও অন্তত শার্ট-প্যান্টের সঙ্গে একটা টাই পরে আসবেন।

- কি ভদ্রলোককে দেখে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছো?

আমার পেছনে ছোটকাকু কখন এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাইনি। একই সঙ্গে ছোটকাকু ভদ্রলোককে ভেতরে আসার আহ্বান জানালেন আর আমাকে বললেন,

তুমি বোধহয় মনে করেছিলে, ফিটফাট কোনো ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। ছোটকাকুকে নিয়ে এই এক মুশকিল! কি করে যে আমার মনের কথা টের পেয়ে যান! তাই আমতা আমতা করে বললাম,

ঠিক তেমন নয়।

আমিও বুঝতে পারছি। তুমি ছোটকাকুর বন্ধু হিসেবে ছোটকাকুর মতো একজন স্মার্ট লোককে আশা করেছিলে।

দরজায় দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক প্রতিটা শব্দ এতো সুন্দর উচ্চারণ করে বললেন যে, তাতে মনে হলো ভদ্রলোক আমার অনেক পরিচিত। ভদ্রলোক আমাকে পাশ কাটিয়ে ড্রইং রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য এমন, না বলা যায় রোগা পাতলা, না বলা যায় মোটা-তাজা। হাইট পাঁচ ফুট, আট বা নয় হবে। মুখভর্তি পাকা দাড়ি। কেমন অদ্ভুতভাবে সরু হয়ে মুখ থেকে নিচে নেমে এসেছে। পরে আছেন হাঁটু পর্যন্ত একটা নীল রঙের পাঞ্জাবি। আর এই রকম পোশাক পরা একজন লোককে ছোটকাকু যখন পরিচয় করিয়ে দিলেন, ভদ্রলোকের পেশা ছিল একজন মেরিন বায়োলজিস্ট হিসেবে, তখন আরেকবার অবাক হবার পালা।

ভদ্রলোক ছোটকাকুর দিকে তাকিয়ে বললেন,

অনেক দিন পর এই পরিচয়টার কথা মনে হলো।

ছোটকাকু জবাবে বললেন,

এখন আমার মনে পড়ে ভূমধ্য সাগরের বিভিন্ন জায়গায় তুমি নানা অদ্ভুত প্রজাতির হাঙর দেখছো, আর আমাকে চিঠি লিখে জানাচ্ছো।

সেই সময়গুলো ছিল দারুণ, দিন গেছে সব অদ্ভুত। কতো রকম হাঙর যে জাহাজে তুলে কেটেছি! আর একটা মজার কথা কি জানো-

আমার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন,

হাঙর কিংবা কুমির এসব প্রাণীর পেট কাটার পর পেটের মধ্যে অনেক জীবন্ত মাছ পাওয়া যায়। তথ্যটা আমার জন্য খুব নতুন

এনসিসি ব্যাংক হাউজিং লোন

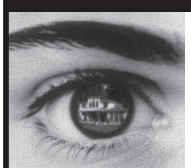

সহজ ও সাশ্রয়ী
সুদের হার মাত্র ১২%

যোগাযোগ করুন :
ধানমন্ডি শাখা-ফোন ৮১১০৫১৮, **গুলশান শাখা**-ফোন ৮৮১৮০৯৩
উত্তরা শাখা-ফোন ৮৯৫৬৪৮৭, **মিরপুর শাখা**-ফোন ৮০১৮০৩৬

নয়। তাই গম্ভীর হয়ে বললাম,

- আমি কয়েক দিন আগে ডিসকভারি চ্যানেলে এ রকম একটা ডকুমেন্টরি দেখেছি।

ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন,

- এটা তো এখনকার কথা। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন ইন্টারনেট ছিল না, মোবাইল ফোন ছিল না। স্যাটেলাইট টেলিভিশন তো ছিলই না। ফলে তখন যে অভিজ্ঞতা হতো সেটাই নতুন মনে হতো। টাটকা মনে হতো। আসলে সেই সময়কার আমাদের অভিজ্ঞতার যে অনুভূতি সেটা এই বয়সের কোনো ছেলে বুঝবে না। ভূমধ্য সাগরের মাঝখান থেকে লেখা একটা চিঠি কুড়ি বা পঁচিশ দিন পর আমাদের এই বাসায় এসে পৌঁছেছে সেটার অনুভূতি আর এখন ই-মেইল করে সেকেন্ডের মধ্যে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে মনের অনুভূতি জানিয়ে দেয়ার পার্থক্যটা বোঝা সত্যিই খুব মুশকিল। যাই হোক, আজকে তো আর সেই পুরনো দিনের কথা বলতে তোমার কাছে আসিনি।

আমি জানি, তুমি পেশা পাল্টেছো।

কথাটা ভুল বললে। ছোটকাকুর কথার পিঠে ভদ্রলোক বললেন,

আমি পেশা পাল্টাইনি। নেশা পাল্টেছি। পড়াশোনার কারণে যদিও আমি মেরিন বায়োলজিস্ট কিন্তু তুমি তো জানো, দিনের পর দিন কিভাবে আমি সমুদ্রের মাঝে ঘুরে বেড়িয়েছি। টাকার কোনো মোহ আমার ছিল না। ঘুরে বেড়িয়েছি শুধুমাত্র অজানাকে জানার জন্য।

থাক সেসব কথা এখন মনে করতে হবে না। বরং তোমার এই নতুন নেশা বা পেশা সম্পর্কে কথা বলা যাক। তার আগে চা বা কফি একটা কিছু হওয়া দরকার।

ছোটকাকু আমার দিকে ফিরলেন।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোক আমার তাকানো দেখেই বুঝতে পারলেন, আমি জানতে চাচ্ছি তিনি কি খাবেন। তাই তিনি বললেন,

তুমি না জানলেও তোমার ছোটকাকু জানে, বেশি লোক যা চায় আমিও তাই চাই।

মানে-

মানে বেশি লোক যা পান করে আমি এখন তাই চাইব।

আমিও তাই বুঝেছিলাম। বাইরে থেকে এসেছেন। নিশ্চয়ই ঠান্ডা কোনো পানীয় পান করবেন।

ছোটকাকু বললেন,

আসলেও তোমার বুদ্ধিতে সমস্যা আছে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি লোক এখন যে পানীয় খায় সেটা সফট ড্রিংকস নয়, কফি।

চায়ের চেয়েও বেশি লোক কফি খায়!

হ্যাঁ। পৃথিবীতে এখন প্রায় ৪০ বিলিয়ন লোক প্রতিদিন কফি খায়। পরিমাণে এক জগের চেয়েও বেশি খায়।

যাই হোক, এক কাপ কফি খাওয়ানোর জন্য এতো কথা শুনতে হবে এটা ভাবিনি। তারপরও পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি লোক কফি খায়- এই তথ্য মাথায় নিয়ে ড্রইংরুম থেকে বাইরে গেলাম। তখনই ছোটকাকু বললেন,

আমার বন্ধু আখতার আহমেদ চৌধুরী যদিও ৪০ বিলিয়ন লোক যে কফি খায় সেই কফি খেতে চাচ্ছে, কিন্তু নিজে এখন এমন একটি কাজ করে যে কাজটি এই ১৪ কোটি লোকের কেউ করে না।

সেটা আবার কি কাজ?

ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি জানতে চাইলাম।

আখতার আহমেদ চৌধুরী এখন যে কাজটা করেন সেটা হলো মানুষ শনাক্তকরণের কাজ।

শুধু মানুষ নয়, অনেক কিছুই শনাক্তকরণ করতে হয় আমাকে।

আমি আবার আখতার আহমেদ চৌধুরীর দিকে তাকালাম। এক সময় ভদ্রলোক মেরিন বায়োলজিস্ট ছিলেন। সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এসব কিছু সত্যি হতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোক মানুষ শনাক্তকরণের কাজ করেন, তার মানে ভদ্রলোক পুলিশ। তাই কখনো হয়? এ রকম চেহারার কোনো মানুষ কখনো পুলিশ হয় না।

কথাটা বলতেই ছোটকাকু বলে উঠলেন,

তুমি আসলেও ফুলিশ রয়ে গেছ! মানুষ শনাক্তকরণের কাজ করতে পুলিশ হতে হয় না। প্রথম প্রয়োজন হলো এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটার।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে না দেখলেও ছোটকাকু বেশ বুঝতে পারলেন আমার চোখ দুটো বড় হয়ে গেছে। তখন ছোটকাকু বললেন,

- আগে কফির ব্যবস্থা করো, তারপর অন্য কথা।

তিন.

কফি নিয়ে আমি আবার যখন ড্রইং রুমে এলাম তখন দেখলাম ছোটকাকু আর আখতার আহমেদ চৌধুরী সোফায় বসে রয়েছেন। সামনে কতোগুলো ছবি। টেন-টুয়েলভ সাইজের। প্রথম যে ছবিটার দিকে চোখ পড়লো সেই ছবিটা ধূসর হয়ে গেছে। সাদাকালো ছবি। পরের ছবিটাও সে রকম।

ভদ্রলোক মানুষ শনাক্তকরণের কাজ করেন কিন্তু পুলিশ নন। কফি দিয়ে খালি সোফাটায় গিয়ে বসলাম। ছোটকাকু ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পুরনো দিনের একটা ছবিতে মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা দেখছেন। আর আখতার আহমেদ চৌধুরীর হাতে যে ছবিটা সেটা একেবারেই ঝকঝকে একটা ছবি। একজনের হাতে পুরনো দিনের ছবি, আরেকজনের হাতে নতুন ছবি- কিছুই বুঝতে পারলাম না। ছোটকাকু আমার দিকে তাকালেন। হাতের ছবিটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ছবিটা নিয়ে ভালোমতো দেখলাম। কিছু ধূসর হয়ে যাওয়া মানুষের চেহারা ছবিটায় রয়েছে। ছবিটা এতোই পুরনো যে, আমার ধারণা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলেও এই ছবিতে কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। কে জানে, এতো মনোযোগ দিয়ে এতোক্ষণ এরা কি দেখছিলেন এই ছবিতে। আমি চোখে একটু বিস্ময় নিয়ে কাকুর দিকে তাকালাম। ছোটকাকু বিস্মিত না হয়ে আখতার আহমেদ চৌধুরীর কাছ থেকে চকচকে নতুন ছবিটা নিয়ে আমাকে দিলেন। ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঢাকার কার্জন হলের সামনে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। এই ছবি নিয়ে এতোক্ষণ দু'জন কি দেখছিল, কি করছিল সেগুলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। অথচ ছোটকাকু আর আখতার সাহেব নতুন আরো দুটো ছবি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমি আবার চকচকে ছবিটার দিকে তাকালাম। নিশ্চয়ই ছবিতে কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। নইলে ছোটকাকু এতো মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখতেন না।

- কি? ছবির কোনো বিশেষত্ব তোমার চোখে পড়ছে?

ছোটকাকুর প্রশ্ন শুনে তার দিকে তাকিয়ে বললাম,

-তেমন কিছু তো চোখে পড়ছে না।

- ছবিটা কোথায় তোলা বুঝতে পারছো?

আখতার আহমেদ চৌধুরী চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন।

- হ্যাঁ। সেটা বুঝতে পারছি। ঢাকার কার্জন হলে তোলা।

- যথেষ্ট মেধাবী তুমি। এটুকুও অনেকেই বুঝতে পারে না।

আজকে দুপুরের পর থেকে এই প্রথম কোনো প্রশংসাসূচক বাক্য শুনলাম।

আখতার আহমেদ চৌধুরী বললেন,

এবার পুরনো ছবিটা দেখো। কিছু বুঝতে পারছো কি না?

পুরনো ছবিটা আবার মনোযোগ দিয়ে দেখলাম। এবার বুঝতে পারছি- এই

ছবিটাও একই জায়গায় তোলা। ঝুলানো বারান্দার জায়গায় ছবির ইমালশান এখনো নষ্ট হয়নি। ঝুলানো বারান্দাটাই বলে দিচ্ছে, এই ছবিটাও কার্জন হলের সামনে তোলা। কার্জন হলের সামনে যে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে আছে তাদের কাউকে অবশ্য চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু নতুন ছবিতে সবার চেহারাই স্পষ্ট। আমি আখতার আহমেদের দিকে তাকিয়ে বললাম,

- মনে হয়, দুটো ছবি একই জায়গায় তোলা!

- শুধু একই জায়গায় নয়, একই সময়ে তোলা।

- ছোটকাকু, আমার সঙ্গে ঠাট্টার একটা সীমা থাকা উচিত।

এই ছবিটা কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে তোলা। আর এটা হলো সাম্প্রতিক সময়ে তোলা। পুরনো এবং নতুন ছবি দুটো পাশাপাশি রেখে আমি বললাম।

- আসলে তোমার ছোটকাকু ঠিক কথাই বলেছে। দুটো ছবি শুধু একই সময়ে তোলা নয়, দুটো আসলে একই ছবি।

- কি বলছেন আপনি!

আমি আবার ছবিগুলোর দিকে তাকালাম। পুরনো ছবিটা পঞ্চাশ বছরের পুরনো হতে পারে কিন্তু নতুন ছবিটা একই ছবি হয় কি করে? ছোটকাকু বললেন,

কার্জন হলের এখনকার রঙ তোমার মনে আছে?

কেন মনে থাকবে না। আজ সকালেও তো কার্জন হলের সামনে দিয়ে এলাম। কার্জন হলের লাল রঙ দেখলেই আমার জয়পুরের পিংক সিটির কথা মনে পড়ে।

তাহলে ছবিতে কার্জন হলের কি রঙ তুমি দেখতে পাচ্ছো?

ছোটকাকুর কথা শুনে ছবির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, কার্জন হলের যে ছবি আমি দেখছি সেই কার্জন হলের রঙ লাল নয় সাদা। পঞ্চাশ বছর আগের ছবিটা অস্পষ্ট হলেও বোঝা যাচ্ছে সেখানেও কার্জন হলের রঙ সাদা। আর কার্জন হলের ওপর থেকে লাল-সাদা কাপড় ঝুলানো রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে কোনো একটা উৎসবের সময় কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছবিটা তুলেছেন। কথাটা ভাবতেই চট করে মাথায় আরেকটা জিনিস ধাক্কা খেল। নতুন ঝকঝকে ছবিটা, যেটা আমি নতুন বলেছিলাম, সেই ছবিটা কার্জন হলের সামনে যে লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে তাদের পোশাক মোটেই বর্তমান কালের মতো নয়। পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে বহুদিনের পুরনো ফ্যাশন এটা।

যে কোট বা শার্ট লোকগুলোর গায়ে রয়েছে সেই ধরনের ডিজাইন এখন কেউ পরে না।

কথাটা বললাম।

- তুমি ঠিকই ধরেছো। পঞ্চাশ বছরের আগের পোশাকের ডিজাইন ঢাকা শহরে এখন দেখা যায় না।

সেটা বুঝলাম। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগের ছবিটা এ রকম ঝকঝকে হলো কি করে? তাও আবার রঙিন।

প্রশ্নটা করে মনে হলো- কম্পিউটার ব্যবহার করে এখন অনেক কিছুই করা সম্ভব। শুনেছি, কম্পিউটার দিয়ে একজনের মাথা কেটে আরেকজনের দেহে লাগানো হয়। ইচ্ছা করলে কম্পিউটার দিয়ে টেলিভিশন অনুষ্ঠানের একটা মেয়ের শরীরের কাপড়টা পুরো সাদা করে শুধু কপালের টিপটা লাল দেখানো সম্ভব। সুতরাং এটাও হয়তো কম্পিউটারের কোনো খেলা। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো, কম্পিউটার পুরনো জিনিস নতুন করবে কি করে?

উত্তরটা দিলেন আখতার আহমেদ চৌধুরী।

পঞ্চাশ বছর আগের ছবি আসলে এখন এ রকমই করা সম্ভব। যদি ছবিটার মধ্যে কিছু জিনিস এখনো অক্ষুণ্ন থাকে। এমন অনেক ছবি রয়েছে চোখে ভালোই দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেটা রঙিন করা বা আরো স্পষ্ট করা কঠিন। তবে কিছু কিছু ছবি রয়েছে যেমন তোমার হাতে এখন যে কার্জন হলের ছবিটা রয়েছে সেটা খালি চোখে খুব ভালো দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুব ভালো মতো দেখলে দেখা যাবে মানুষের আকৃতিগুলো নিখুঁতভাবেই রয়ে গেছে। সেগুলোর ওপর নির্ভর করেই রোবো-কম্পিউটার বলে একটা যন্ত্র বের হয়েছে। সেই যন্ত্র দিয়ে ছবিগুলো এ রকম ঝকঝকে করে তোলা সম্ভব।

রোবো কম্পিউটার! রোবো শব্দটা কি রোবটের সংক্ষিপ্ত রূপ?

ঠিক তাই। রোবটের চোখের এ রকম রশ্মির সাহায্য নিয়ে ছবির বিষয়বস্তুতে নতুনভাবে নতুন রূপে এ রকম ঝকঝকে প্রিন্ট করা সম্ভব। সিঙ্গাপুরের একটা স্টুডিওতে এই প্রযুক্তি এসেছে। সেখান থেকেই আমি এই প্রিন্ট করেছি।

ছবি দুটো আমি আবার হাতে নিলাম। নতুন বিস্ময়ে নতুনভাবে ছবি দুটো আবার দেখছি। ঢাকার কার্জন হলের সামনে কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কারো কারো গায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে যে রকম গাউন থাকে সে রকম গাউন।

তুমি যে ছবিটা দেখছো তার বাইরেও আরো কিছু ছবি রয়েছে আমার কাছে।

আখতার আহমেদ চৌধুরীর কথায় ছোটকাকু বললেন,

সে সব ছবি না হয় পরে দেখবো কিন্তু তোমার এখানে আসার কারণ কি? এই ছবি দেখানো?

তুমি ভাবছো আমার এই নতুন নেশা সম্পর্কে তোমাকে কিছু জ্ঞান দান করবো।

না, না- আমি সে রকম কিছু ভাবছি না। কারণ আমি জানি, তুমি নিজের কাজের জগৎ নিয়ে এতো ব্যস্ত থাকো যে অন্য কিছু নিয়ে খুব একটা ভাবো না।

আসলেও তাই।

আখতার আহমেদ চৌধুরী কথাটা বলে ঘুরে আমার দিকে তাকালেন। বললেন,

তুমি মনোযোগ দিয়ে যে ছবিটা দেখছো সেখানে তোমার পরিচিত একজন আছে।

আমি চমকে আখতার আহমেদ চৌধুরীর দিকে তাকালাম। এতোক্ষণ ধরে ভদ্রলোককে তো সুস্থ মানুষ বলেই মনে হচ্ছিলো। পঞ্চাশ বছর আগের ছবি। বলে কি না আমার পরিচিত মানুষ আছে! স্টারের একটা চ্যানেল রয়েছে স্টার রোড। সেখানে পুরনো দিনের সব ছবি আমার মা খুব আগ্রহভরে দেখেন। মাঝে মাঝে আমাকে দু-একজন শিল্পীর নাম বলতে বললে আমি রাগ করে বলে উঠি- এতো আগের শিল্পীর নাম আমি কি করে জানব?

কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাগ করতে পারলাম না। ছোটকাকুর বন্ধু! তার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিয়ে বললাম,

পঞ্চাশ বছর আগের কোনো মানুষকে আমার চেনার কথা নয়। ছোটকাকুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনিও মিটি মিটি হাসছেন। বললেন,

আসলেও কিন্তু ছবিতে তোমার খুব চেনা একজন মানুষ রয়েছে। আবার আমি ছবির দিকে তাকালাম। এক-দুই করে মোট সাতজন মানুষ রয়েছে। এদের কাউকেই আমার চেনার কথা নয়। ছোটকাকু বললেন,

তুমি বাম দিক থেকে ছবির দিকে তাকাও। দ্যাখো, এক, দুই, তিন, এই যে চার নম্বর লোকটাকে তুমি চেন?

আমি চার নম্বর লোকটার দিকে তাকালাম। একটু লম্বাটে মুখ। মাথার চুলগুলো- এই মানুষটির ছবি আমি কোথাও দেখেছি।

কোথায়? কোথায়?

ভাবার চেষ্টার করলাম। মনে পড়েছে- ভদ্রলোকের ছবি আমি দেখেছি বইয়ের মলাটে। ভদ্রলোকের ছবি আমি দেখেছি দেবদাস ছবির শুরুতে। ভদ্রলোকের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জোরে নামটা বলতেই ছোটকাকু বললেন,

একদম ঠিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের ছবি এটা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই সমার্তন উৎসবে ঢাকা এসেছিলেন।

দুপুর থেকে আজকে আমি নীরব বিপ্লবের কথা ভাবছিলাম। আবার একটা নীরব বিপ্লব। পঞ্চাশ বছর আগের একটা

ছবি নতুন করে কিভাবে আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। শুধু ছবি ফিরে আসা নয়, একটা নতুন পেশা বা নেশা সেটাও এসেছে আমাদের জীবনে! এখন আমি বুঝতে পারছি- আখতার আহমেদ চৌধুরী যে মানুষ শনাক্তকরণের কাজ করেন তার মানে কি? একসময়কার মেরিন বায়োলজিস্ট এখনকার মানুষ শনাক্তকারী পেশার এই মানুষটি না জানি কোন নতুন রহস্য নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছেন!

চার.

আলীবাবা চল্লিশ চোরের গুপ্তধনের কথা পড়েছিলাম অনেকদিন আগে। ট্রেজার আইল্যান্ডের গুপ্তধনের মতো গুপ্তধনের কথা ভেবেছি বহুবার। কিন্তু সত্যি সত্যি একটা গুপ্তধনের ভান্ডার আমাদের এই ড্রইংরুমে এসে পৌঁছাবে এই কথা কোনোদিন ভাবিনি। আখতার আহমেদ চৌধুরীর হাতে ব্যাগটি সে রকম একটা গুপ্তধনের ভান্ডার। আখতার আহমেদ চৌধুরীর হাতে করে এসে পৌঁছেছে আমাদের ঘরে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের সামনে শরৎচন্দ্রের ছবির পর যে ছবিটা তিনি দেখালেন সেটা আরো সাংঘাতিক। একটা ছবির মধ্যে দেখা যাচ্ছে- জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অন্তত ১০০টা হাতি হেঁটে যাচ্ছে। জঙ্গলের গাছগুলোও বেশ বড়।

এই জায়গাটা কোন জায়গা তোমরা কি কেউ ধারণা করতে পারো?

প্রশ্ন করলেন আখতার আহমেদ চৌধুরী। গাছপালার আকৃতি, চেহারা, পরিবেশ বলে দিচ্ছে ছবিটা বাংলাদেশের। কিন্তু বাংলাদেশের সুন্দরবনে কি এতো হাতি আছে?

এতো কি? সুন্দরবনে আদৌ কোনো হাতি আছে কি? তাহলে? তাহলে কি এই হাতিগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো এলাকার? কথাটা বলতেই হো হো করে হেসে আখতার আহমেদ চৌধুরীর হাতিরপালের চকচকে ছবিটার সঙ্গে আমার হাতে তুলে দিলেন মলিন হয়ে যাওয়া, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ছবিটা। অর্থাৎ এই ছবিটাও অনেক পুরনো। আখতার আহমেদ চৌধুরী বললেন,

ছবিটা যখন তোলা হয়েছে তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্যামেরা নিয়ে যাবার সাধ্য কারও ছিল না। তাহলে এই হাতির পালের ছবি বাংলাদেশের কোথায় তোলা হলো?

আমার প্রশ্ন শুনে ছোটকাকু বললেন,

এই হাতির পালের ছবি কোথায় তোলা হয়েছে সেটা ভাবার জন্যে পুরো বাংলাদেশের ম্যাপ দেখার প্রয়োজন হবে না। তুমি যে ঢাকা শহরে আছো এই ঢাকা শহরেই এই ছবিটা তোলা।

আমি পরম বিস্ময়ে ছোটকাকুর দিকে তাকালাম। বললাম,

- একশ' হাতি ঢাকা শহরে!

- হ্যাঁ। এই ঢাকা শহরেই একশ' কেন আরো বেশি হাতির পাল ঘুরে বেরিয়েছে। সময়টাও খুব বেশি দিন আগের নয়। খুব বেশি হলে একশ' বছর আগে।

- একশ' নয়। ৯৭ বছর আগে ফরাসি একজন ফটোগ্রাফার পল সার্ত্রে এই ছবিগুলো তুলেছিলেন। তিনি তার ভারী ক্যামেরা নিয়ে কিভাবে এই দেশে এসেছিলেন এবং জঙ্গলের একটা গাছের ওপর দুই রাত থেকে এই হাতির পালের ছবি তুলেছিলেন, সেই বর্ণনা দিয়ে পরবর্তীকালে একটা বইও তিনি লিখেছিলেন। লন্ডনের শার্লক হোমস জাদুঘরের উল্টোদিকে পুরনো বইয়ের কয়েকটা দোকান আছে। সেখান থেকেই সেই বইটা আমি কিনেছিলাম।

আখতার আহমেদ চৌধুরীর কথা শেষ না হতেই ছোটকাকু বললেন,

যথারীতি সে বই পড়ার পর তুমি চলে গেলে ফ্রান্সে।

ঠিক বলেছো। কিন্তু পল সার্ত্রের বাড়ি যদি প্যারিসে হতো তাহলে কোনো অসুবিধা হতো না। কিন্তু পল সার্ত্রের বাড়ি খোঁজার জন্য আমি ফ্রান্সের যে গ্রামে গিয়ে বাড়ি খুঁজে বের করেছিলাম সেটা নিয়ে একটা বই হতে পারে।

আমি দুপুর থেকেই একটার পর একটা ঘটনায় বিস্মিত হচ্ছিলাম। নীরব বিপ্লবের কথা ভাবছিলাম। লন্ডন শহরের একটা পুরনো বই জোগাড় করে, সেই বইয়ের সূত্র ধরে ফ্রান্সের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামে কেউ যায় সেটাই আমার কাছে পরম বিস্ময়। কিন্তু বিস্ময়ের ভাবটা প্রকাশ না করে বললাম,

তারপর পল সার্ত্রের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি কি আপনাকে এই ছবিটা দিলেন?

পল সার্ত্রে যখন ১০০ বছর আগে এ দেশে এসেছিলেন তখন তার বয়স ছিল ৩০। আর আমি যখন পল সার্ত্রের বাড়িতে যাই তখন পল সার্ত্রের তৃতীয় পুরুষ সেখানে বাস করে। সেটাও একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার ছিল ইংরেজি বোঝানো। এক ফরাসি ভাষা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। অনেক কষ্টে, ইশারা-ইঙ্গিতে পুরো ব্যাপারটা বোঝানোর পর পল সার্ত্রের একটা পুরনো চামড়ার বাক্স এনে আমাকে দেয়।

আমি আর ছোটকাকু পরম উৎসাহের সঙ্গে আখতার আহমেদ চৌধুরীর কথা শুনছি। আখতার আহমেদ চৌধুরী তখন বলে যাচ্ছেন,

ধুলো ভরা সেই বাক্সটা পেয়ে আমার মনে হলো আমি যেন একটা গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। বাক্সটার মধ্যে পল সার্ত্রের ব্যবহৃত একটা ক্যামেরা আর কয়েকটা ছবি রয়েছে। এ ছাড়া পল সার্ত্রের ব্যবহৃত কয়েকটা ব্যক্তিগত জিনিসও বাক্সটায় ছিল। এগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য কত সেটা পল সার্ত্রের পরিবারের কেউ বুঝতেও পারেনি। আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম, তাদেরকে সেইসব কথা। ইশারা-ইঙ্গিতে, অর্ধেক ইংরেজি অর্ধেক বাংলায়। কিন্তু কিছুতেই তারা বুঝতে পারলো না পুরো ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত এক হাজার ডলার দিয়ে জিনিসপত্র সমেত পুরানো বাক্সটা আমি কিনে নিয়ে আসি।

মাত্র এক হাজার ডলারে এ রকম একটা গুপ্তধন?

বললাম আমি।

হ্যাঁ, তবে ফ্রান্সের একটা জাদুঘর পল সার্ত্রের কথা জানত। সেই জাদুঘরে পল সার্ত্রের পরিবারের নাম দিয়ে তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র, পরনের কাপড়-চোপড় আর ক্যামেরাটা দিয়ে দিয়েছি। শুধুমাত্র বাংলাদেশে তোলা তার কয়েকটা ছবি আমি নিয়ে এসেছি।

ছবিটার দিকে আমি তাকাই। একশ' বছর আগে একজন ফরাসি পর্যটক এই দেশে এসে এই ঢাকা শহরে ছবিটা তুলেছে। দিনদুপুরে ঢাকায় একদিন এই রকম হাতির পাল ঘুরে বেড়াতো।

হাতির পাল এই ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াতো এই নিয়ে কি তোমার কোনো সন্দেহ আছে?

ছোটকাকু যে কি করে আমার মনের কথা টের পায়!

না, সে রকম কোনো সন্দেহ নেই। তবে-

তবে না। তুমি ভেবে দ্যাখো হাতিগুলো যেখানে ঘুরে বেড়াতো সেটার প্রমাণ নিয়ে ঢাকায় এখনও একটা জায়গার নাম রয়েছে।

তুমি কি পিলখানার কথা বলছো?

ঠিক তাই, শুধু পিলখানা নয়, সেখান থেকে হাতির পাল বেরিয়ে এখন যেখানে গুলশান এলাকা সে সব গহীন জঙ্গলে চলে যেত যে পথ দিয়ে সেই পথটার নাম এখনো কিন্তু এলিফ্যান্ট রোড। আর রানী এলিজাবেথ যখন আসেন এই দেশে তখন তৈরি হয়েছিল এয়ারপোর্ট রোড। সে কারণে এখন কিন্তু এলিফ্যান্ট রোডের দুটো অংশ হয়ে গেছে। একটা নিউমার্কেট এলাকায়। আর একটা মগবাজার

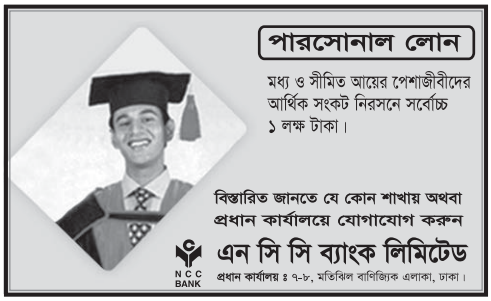

এলাকায়।

আমার কাছে আরেকটা ছবি রয়েছে। এই ছবিটা দ্যাখো, ১৯০৪ সালে তোলা। বঙ্গভঙ্গ আলোচনার জন্য ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড কার্জন এসেছিলেন।

আগ্রহ ভরে আমি আর ছোটকাকু ছবির দিকে তাকালাম। পুরনো দিনের একটা গাড়ির সামনে পাগড়ি পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন।

আখতার আহমেদ চৌধুরী তখন বললেন,

- পাগড়ি পরা লোকটি নিশ্চয়ই তোমার চেনা!

- হ্যাঁ। খুব সম্ভব ভদ্রলোক নবাব স্যার সলিমুল্লাহ।

আমার কথা শুনে আখতার আহমেদ চৌধুরী বললেন,

তুমি ঠিকই বলেছো। আর এই গাড়িটা ঢাকা শহরের প্রথম মোটর গাড়ি। ১৯০৬ সালে এখানে আলোচনার জন্য ইংরেজ লাট সাহেব এসেছিলেন। তার জন্য এই গাড়ি আনা। পুরো ঢাকা শহরে তখন একটাই রাস্তা।

ঢাকা শহরের প্রথম গাড়ির ছবি দেখছি। আবার একদিকে দেখছি এই শহরেই একদিন প্রধান সড়ক দিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে হাতির পাল। আর এখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে দেখতে পাব রাস্তায় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে লেটেস্ট মডেলের একটা বিএমডব্লিউ কিংবা মার্সিডিজ। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। আখতার আহমেদ চৌধুরী নিশ্চয়ই পুরনো ঢাকার ছবিগুলো দেখাতে আমাদের এখানে আসেননি।

কথাটা বলতেই আখতার আহমেদ চৌধুরী বললেন, ছবিগুলো যে দেখাতে আসিনি তা ঠিক নয়, ছবিগুলোও দেখাতে চেয়েছি, পল সার্ত্রের কথা বলতে চেয়েছি এবং তার সঙ্গে আরো কিছু ব্যাপার তো রয়েছেই।

এই পর্যন্ত বলে আখতার আহমেদ চৌধুরী ব্রিফকেস থেকে আরেকটা ছবি বের করলেন। ছোটকাকু আর আমি একই সঙ্গে ছবিটা দেখে চমকে উঠলাম। এই ছবিটাও ১৯০৪ সালেই তোলা। কারণ ঢাকার প্রথম গাড়িটার পাশে তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। একজন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ আর দু'জন বিদেশী। একজন পুরুষ। একজন মহিলা।

এই ছবিগুলো আমি সযত্নে আমার আর্কাইভে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু কয়েকদিন আগে ঢাকার একটা দৈনিক পত্রিকায় একটা ছবি দেখে আবার এগুলো বের করেছি।

কয়েকদিন আগে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার ছবির সঙ্গে প্রায় একশ' বছর আগের একটা ছবির কি সম্পর্ক কিছুই বুঝতে পারলাম না।

দৈনিক পত্রিকাটা ও ছবিটা আমাদের সামনে দিলেন আখতার আহমেদ চৌধুরী। একটি অনুষ্ঠানে একটা ক্রেস্ট হাতে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছেন। একদিকে একশ' বছর আগের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন মানুষ আর অন্যদিকে কয়েকদিন আগে ছাপা হওয়া কয়েকজন মানুষের ছবি। কোনো মিলই খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু আমি যত সহজে হাল ছেড়ে দেই ছোটকাকু তত সহজে হাল ছেড়ে দেন না। তাকে দেখলাম ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পত্রিকার ছবিটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে। আখতার আহমেদ চৌধুরীও বেশ আগ্রহ নিয়ে ছোটকাকুর দিকে তাকিয়ে আছেন। পরিস্থিতি কেমন যেন থমথমে। আমি কি আরেক রাউন্ড কফির কথা বলবো?

এই সময় ছোটকাকু মুখ তুলে বললেন,

আমার মনে হয়, আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি।

পুরনো ছবিটা এবং পত্রিকার ছবিটা পাশাপাশি রাখলেন তিনি। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

- এবার ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখো কিছু বুঝতে পারো কি না!

আমি আবার ছবির দিকে তাকালাম। দুটোই রঙিন ছবি। একটি ছবিতে গাড়ির সামনে তিনজন দাঁড়িয়ে আছে আগেই দেখেছি। পত্রিকার ছবিটা আবার ভালো করে দেখলাম। বড়লোকের কোনো ড্রইংরুম হবে। চারজন দাঁড়িয়ে আছে। তিনজন পুরুষ, একজন মহিলা। মহিলার হাতে একটা ক্রেস্ট। কোনো কিছুতে পুরস্কার পেয়েছেন মনে হচ্ছে। এই দুটো ছবির মধ্যে আমি কোনো মিলই খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু ছোটকাকু যখন কোনো মিল খুঁজে পেয়েছেন তখন নিশ্চয়ই কিছু আছে ছবি দুটোর মধ্যে।

আবার দেখলাম আমি। ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা চোখে দিলাম। তাতে গাড়ির ছবিটায় গাড়ির পুরনো দিনের অংশগুলো বিশেষ করে রিকশার মতো স্পোকঅলা চাকাগুলো প্রকট হয়ে দেখা দিল। হঠাৎ করেই একটা জিনিসে চোখ আটকে গেল। চট করে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলে উঠলাম আমি,

- এই তো পেয়ে গেছি আমি রহস্যের গন্ধ। বিনা দ্বিধায় আমি বলতে পারি, আখতার আহমেদ চৌধুরী কি কারণে ছোটকাকুর কাছে এসেছেন।

ব্যাপারটা নিয়ে ছোটকাকুর কাছে কাউকে আসতে প্রায় একশ' বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। কথাটা ভাবতেই মনে হলো, অপেক্ষারই আরেক নাম প্রতীক্ষা! আর প্রতীক্ষা মানেই শুভ কিছু।

পাঁচ.

আখতার আহমেদ চৌধুরী এক সময় মেরিন বায়োলজিস্ট ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে কাজ করছেন ছবি শনাক্তকরণের মতো রহস্যময় একটা কাজ। কিন্তু তিনি ইচ্ছে করলে গোয়েন্দার কাজও করতে পারেন। এই ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নাই। কারণ যে জিনিসটা তিনি আবিষ্কার করেছেন ছবি দুটো দেখে, তা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

একশ' বছর আগের ছবিটায় যে বিদেশী মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন তার গলায়, হাতে একটা গয়নার সেট পরা। আঙুলে একই ডিজাইনের একটা আংটি রয়েছে। আংটিটা দেখার মতো। আঙুলের ওপর একটা বাঘের মাথা। ছোটকাকু বললেন, একটা জিনিস স্পষ্ট। নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহই মহিলাকে গয়নার সেট উপহার দিয়েছিলেন।

সেটা তুমি কি করে বুঝলে?

সবসময় বাংলাদেশের প্রতীক হিসেবে, শক্তির প্রতীক হিসেবে বাঘ ব্যবহার করা হয়েছে। সেই হিসেবে বোঝা যাচ্ছে- এই আংটিটা নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বিদেশী মহিলাকে উপহার দিয়েছিলেন। অনুমান করে বলা যায়- ভদ্রমহিলার গলার হার, হাতের মোটা চুড়ি, সবকিছু শুধু সোনা দিয়ে তৈরি নয়। সঙ্গে রয়েছে দামী পাথর।

আখতার আহমেদ চৌধুরী ছোটকাকুর কথা শুনে বললে,

- তুমি ঠিকই বলেছো, এটা শুধু দামী পাথর নয়, এই পাথরটার নাম জিটেন। পৃথিবীতে এ ধরনের পাথর দিয়ে এখন আর গয়না তৈরি হয় না। বলা যেতে পারে, পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান পাথর এটি।

দাঁড়াও। দাঁড়াও।

ছোটকাকু আখতার আহমেদ চৌধুরীকে থামিয়ে বললেন,

তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে এই ছবিটায় দেখছো কী পরিমাণ পাথর রয়েছে এই আংটিতে।

আমি শুধু দেখেনি। পাথর গুনেছিও। সব মিলিয়ে এই গয়না সেটটার দাম এখন এক কোটি টাকার উপরে। আর টাকার কথা বাদ দিয়ে এর ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয়ই তোমাদের দু'জনের কাউকে বলে বোঝাতে হবে না।

ছোটকাকু আর আখতার আহমেদ চৌধুরীর কথা শুনে আমি বুঝতে পারছি-

Festival Business Loan

পর্যাপ্ত রকমারি স্টক।
বেশি বিক্রয়।
বেশি লাভ!

NCC Bank Ltd.
ব্যবসায়ীদের স্বল্পকালীন পুঁজির প্রয়োজনে ব্যাংকের যেকোন শাখায় যোগাযোগ করুন।

আখতার আহমেদ চৌধুরীর এখানে আসার গুরুত্বটা কতোখানি। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখে ছোটকাকু, আর আমি দুজনেই কয়েকদিন আগে পত্রিকায় চারজনের যে ছবিটা ছাপা হয়েছে, সেই ছবিটা দেখলাম। তার ঠিক পেছনের ফ্রেমে একজন বয়স্ক মহিলার ছবি ঝুলছে। যে মহিলার গলায় শোভা পাচ্ছে একশ' বছর আগের একই ডিজাইনের একটা হার, হাতে সেই রকমই চুড়ি। আঙুলে সেই রকম বাঘের মাথাঅলা সেই আংটি।

তোমাদের মনে হতে পারে। একই ধরনের গয়নার সেট দুটো থাকতে পারে।

নাহ্। এটা আমাদের মনে হচ্ছে না। কারণ এ ধরনের জিটেন পাথর দিয়ে তৈরি গয়না দুটো থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

তাহলে সেই প্রশ্ন যদি না ওঠে নতুন একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

প্রশ্নটা, এবার স্যার সলিমুল্লাহর পাশের এই বিদেশী মহিলার গলার গয়নার সেটটা চলে যাওয়ার কথা বিলেতে। সেখানে গয়নার সেট এ দেশের একজন মহিলার গলায় এলো কি করে?

এই প্রশ্নের জবাবের জন্যই আমার এখানে আসা।

আমি আখতার আহমেদ চৌধুরীর দিকে তাকালাম। এতোক্ষণ কথা বলে আমার যা মনে হয়েছে তাতে একটা ছবি দেখার পরই কারও কাছে সাহায্যের জন্য তার আসার কথা নয়।

কথাটা বলতেই ছোটকাকু বললেন, আমিও তাই ভাবছিলাম।

ছবি দেখার পরে তুমি কি করলে?

তুমি দেখছো পত্রিকাটি বেরিয়েছে ঠিক সাত দিন আগে।

তার মানে ছবিটা আরো দু'দিন আগে তোলা। মফস্বলের ছবি সাধারণত দু-একদিন পরেই পত্রিকায় ছাপা হয়।

হ্যাঁ তাই। ছবিটা দশ দিন আগে তোলা। ক্রেস্টটা যে মেয়েটির হাতে দেখতে পাচ্ছো সে বিবিসির একটা রচনা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ রচনা লিখেছে। সেই হিসেবে পুরস্কারটা পেয়েছে সে।

এইসব তথ্য হয়তো পত্রিকার পাতাতেই লেখা আছে। সুতরাং আখতার আহমেদ চৌধুরী নতুন করে কি বলতে চাচ্ছেন? ছোটকাকুর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, তিনিও একই কথা ভাবছেন। আখতার আহমেদ চৌধুরীও হয়তো বুঝতে পারলেন আমার মনের কথা। তিনি বললেন,

পত্রিকায় এই ছবি দেখার পর আমি পত্রিকা অফিসে গিয়ে স্থানীয় সংবাদদাতার সঙ্গে কথা বলে এই মেয়েটির ফোন নম্বর জোগাড় করে কথা বলি।

মেয়েটির সঙ্গে?

না। এই যে মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে যে ভদ্রলোক পাকা চুল, খুব সম্ভব, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে।

কি বললেন তিনি?

বলা তো পরের কথা। আমার পরিচয় পেয়ে যেভাবে তিনি বকাঝকা শুরু করলেন, তাতে আমি নিজেই অবাক হয়ে পড়েছিলাম।

ভদ্রলোককে দেখে তো বেশ ভদ্রই মনে হচ্ছে।

ছবিতে তো ঐ অসুবিধা। কার ভেতর কি আছে বোঝা যায় না। আর ভদ্রলোক শুধুই বকঝকা করলেন তাই নয়, আমি যখন পেছনের ছবির মহিলার গয়নার কথা বললাম তখন শুধু বকা নয়, ভদ্রলোক রীতিমতো ধমক দিয়ে বললেন, এসব ব্যাপার নিয়ে আমি যেন আর কখনোই ফোন না করি।

তোমাকে যতদূর চিনি- এই ফোনে বকা বা ধমক খেয়ে তোমার তো ঘাবড়ে যাবার কথা নয়।

না, না, আমি ঘাবড়াইনি মোটেও। কিন্তু এ রকম পরিস্থিতিতে আমি কখনো পড়িনি। ভদ্রলোক ভদ্রভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। সে জন্য পরদিনই আমি চলে গেলাম ভদ্রলোকের বাড়িতে।

একেবারে সরাসরি ভদ্রলোকের বাড়িতে?

হ্যাঁ। সেখানে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বললাম। কিন্তু তার পরপরই ভদ্রলোক দেশের বাইরে চলে গেলেন।

তা ভদ্রলোক কবে আসবেন? তখন আমাকে নিয়ে যেও। জিজ্ঞেস করবো- তোমার মতো একজন ভদ্রলোককে কেন তিনি এতো বকাঝকা করেছেন!

ব্যাপারটা এতো হালকাভাবে নিও না! কোটি কোটি টাকার একটা গয়নার দাম এখন কত ভেবে দেখছো?

কিন্তু তোমার কাছে কোনটা বেশি জরুরি? ভদ্রলোকের খারাপ ব্যবহার না গয়নার দাম?

দুটোই। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই থেমে গেলে ভালো হতো। আমি অপেক্ষা করতাম, ভদ্রলোক বিদেশ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত।

এই সময় আখতার আহমেদ চৌধুরীর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো। ফোনটার দিকে তাকিয়েই কেমন যেন ভয় পেয়ে উঠলেন আখতার আহমেদ চৌধুরী। বললেন,

আবার সেই ফোন।

কি ফোন? কার ফোন?

শোনো। এই বলে ফোনের ইয়েস এবং স্পিকার দুটো বোতামই চেপে দিলেন আখতার আহমেদ চৌধুরী। ফোনে যান্ত্রিক গলা ভেসে এলো।

আখতার আহমেদ চৌধুরী, তোমাকে এতো বলার পরও তুমি মাথা থেকে গয়নার ভূত নামাচ্ছো না। এখন আবার গ্যাছো গোয়েন্দার বাড়ি। কাল রাতের কথা ভুলে গেছো? এরপর লাঠির বাড়ি একদম ঠিক মাথার মাঝখানে পড়বে।

ফোনের ওপাশ থেকে কেউ লাইনটা কেটে দিল। মোবাইল ফোনে যেখানে নাম্বার ওঠে সেখানে লেখা আছে : প্রাইভেট নাম্বার।

কাল রাতে কি ঘটেছিল?

ব্যাপারটা বলতে চাইনি। কাল রাতে বাড়ি ফেরার সময় একদল লোক আক্রমণ করেছিল। শার্টটা খুলে ভদ্রলোক দেখালেন, ঘাড়ের ওপর একটা বড় কালো দাগ। রক্ত জমাট বেঁধে আছে। কাল রাতে বাড়িটা মাথায় পড়েনি বলে বুঝতে পারলাম ফোনে এই জন্যই ধমক দিচ্ছিলো। এর পরের বাড়িটা মাথার মাঝখানে পড়বে। শুধু এই ফোনে ধমক দেয়া নয়, আখতার আহমেদ চৌধুরী বললেন,

বাসায় একদিন একজন লোক এসেছিল। সেও বলে গেছে, আমি যেন এই ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা না ঘামাই।

ছোটকাকুর মুখের দিকে তাকালাম। খুবই গম্ভীর হয়ে গেছেন। বুঝতে পারছি যে বা যারাই আখতার আহমেদ চৌধুরীর সঙ্গে এই ব্যবহার করছে তাদেরকে মোটেই তিনি পছন্দ করছেন না। বললেন,

তাহলে আমরা কি ভদ্রলোকের বাড়িতে যাব, না ফোন করবো?

আমার মনে হয় ফোন না করে যাওয়া উচিত।

হ্যাঁ। তুমি এই বাসায় এসেছো এটা যারা তোমাকে ফলো করছে তাদের সঙ্গে যাওয়া ভালো।

তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে তুমি এখনই যেতে চাচ্ছো?

অসুবিধা কি?

অসুবিধা আছে। ভদ্রলোকের বাড়ি ঢাকায় তো নয়।

ঢাকায় নয়, কোথায়?

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

রংপুরে।

রংপুর!

হ্যাঁ।

রংপুর হোক, আর যেখানেই হোক, যে ভদ্রলোক আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তার কাছে আমি যাব।

ছোটকাকু কথা কটি বললেন বটে, কিন্তু আমি জানি ছোটকাকু একই সঙ্গে ভাবছেন- জিটেন পাথরের গয়নাটার কথা। একশ' বছর আগের গয়নাটা কোন জাদুমন্ত্রে বা রহস্য নিয়ে ছবির ঐ ভদ্রমহিলার গলায় আশ্রয় নিয়েছে।

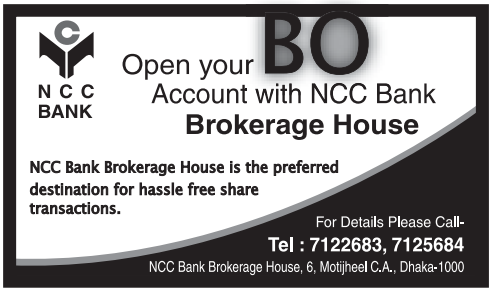

ছয়.

সকালবেলা বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় ভেবেছিলাম, আমাদের পথে কেউ আটকানোর চেষ্টা করবে। আর যদি পথে কেউ না আটকায় একটা গাড়ি অন্তত আমাদের ফলো করবে। কিন্তু সে রকম কোনো ঘটনাই ঘটল না। একটু হতাশ আমি। রংপুর যাওয়ার শুরুতে একটা অ্যাকশন আশা করেছিলাম। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটলো না। গতকাল আখতার আহমেদ চৌধুরী প্রচুর কথা বলেছিলেন। কিন্তু আজকে বেশ চুপচাপ তিনি। ছোটকাকু খুব একটা কথা বলছেন না।

আশুলিয়া পার হয়ে চন্দ্রার মোড় আসতেই রাস্তার পাশে একটা মোড় চোখে পড়লো। কালিহাতী। আখতার আহমেদ চৌধুরীর দিকে তাকাতেই তিনি বুঝে ফেললেন আমি কি বলতে চাচ্ছি। বললেন,

ইতিহাসে আছে, ময়মনসিংহের এই অঞ্চলটা একসময় খুব সমৃদ্ধশালী ছিল। ময়মনসিংহের জমিদারদের নিয়ে অনেক গল্প রয়েছে। অনেক পালা কাহিনীও রয়েছে। টাঙ্গাইলের কাছেই একটা বড় রাজার বাড়ি এখনো আছে।

আমি জানি, মোহরার রাজার বাড়ি পড়বে হাতের ডান দিকে।

হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো। সেই মোহরার রাজার বাড়ির হাতিগুলো থাকতো এই জায়গায়। এ জন্যই জায়গাটার নাম কালিহাতী।

কথাটা শুনে আবার মনে হলো, বাংলাদেশের সব জায়গার নামেরই কোনো না কোনো ইতিহাস রয়েছে। আর কিছু কিছু নাম রয়েছে যেগুলো নিয়ে এখন কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু জায়গাগুলোর নাম ভারী অদ্ভুত। টেকনাফের পথে একটা জায়গার নাম ঘুমঘুম। আর এই রংপুরেই তো একটা নদী রয়েছে যার নাম মাথাভাঙ্গা।

যমুনা ব্রিজ পার হবার আগে যে জায়গাটা তার নাম এলেঙ্গা- এটা অনেকেরই অজানা। আর তারচেয়েও বেশি অজানা, কাউকে যদি জিগ্যেস করা হয় ঢাকার দিক থেকে যমুনা ব্রিজের শুরুতে যে রেল স্টেশনটা রয়েছে তার নাম কি- তার উত্তর অনেকেই দিতে পারবে না। যমুনা ব্রিজের সাথে গাড়ির পাশাপাশি রেলগাড়ি চলার রাস্তা রয়েছে। এটা অনেকেরই জানা। কিন্তু স্টেশনটার নাম যে ইব্রাহিমবাদ সেটা চট করে কারো মনে না হওয়ারই কথা। যমুনা ব্রিজ পার না হতে হতে, এ রকম নানা রকম কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে একটু চোখে ঘুম এসে গিয়েছিল টের পাইনি।

হঠাৎ করেই প্রচন্ড ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা থেমে যেতেই ঘুম ভাঙলো। কি ব্যাপার? ড্রাইভারের দিকে তাকালাম। মনে হচ্ছে টায়ার বার্স্ট করেছে। গাড়ি থেকে নেমে ছোটকাকু, আখতার আহমেদ চৌধুরী বাইরে দাঁড়িয়ে। রাস্তায় প্রচুর তারকাঁটা ছড়ানো।

রাস্তা দিয়ে নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ আগে তারকাঁটা ভরা কোনো ট্রাক গেছে। যে ট্রাক থেকে তারকাঁটাগুলো রাস্তায় পড়েছে।

আমার কথা শুনে ছোটকাকু বললেন,

তোমার বুদ্ধি দিন দিন বাড়ছে না। পথে আসতে আসতে কোনো ট্রাক দেখেছ? আজ সকালেই পত্রিকায় দেখেছি, আজ ট্রাক ধর্মঘট।

তাহলে এতো তারকাঁটা এখানে পড়ল কি করে?

পড়েনি। কেউ ফেলে রেখেছে। তবে সেটাও হঠাৎ করে নয়, আমাদের পথে আটকে রাখার জন্যই।

তার মানে কেউ আমাদের ফলো করছিল?

একটু একশানের গন্ধ পেলাম আমি। কিন্তু একই সাথে হতাশ হলাম ছোটকাকুর কথায়। বললেন,

ফলো করার দরকার নেই। কারণ আমরা কোথায় যাচ্ছি এটা অন্যপক্ষের জানা। সেজন্য আমাদের আগেই তারা এসে পথের মধ্যে এইভাবে কাঁটা ফেলে রেখেছে।

এই সময় আখতার আহমেদ চৌধুরীর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। প্রাইভেট নম্বর দেখে ছোটকাকু বললেন,

ফোনটা ধরার দরকার নেই। কারণ ফোন ধরলে ঐ ধমকই দেবে।

আখতার আহমেদ চৌধুরীও ফোনটা ধরার কোনো চেষ্টা করলেন না। ইতিমধ্যে গাড়ির চাকা বদলে ফেলেছে ড্রাইভার। ড্রাইভার বলল,

সামনেই টায়ার ঠিক করার দোকান রয়েছে। সেখান থেকে টায়ার ঠিক করা যাবে।

ড্রাইভারের কথা শুনে আমি ভাবলাম, টায়ার তো ঠিক করা যাবে। কিন্তু আমরা ঠিকমতো রংপুর পৌঁছাবো কিনা!

আখতার আহমেদ চৌধুরী ফোনে শুধু জিটেন দিয়ে তৈরি গয়নাটার খোঁজ নিয়েছেন। তাতেই এতো উত্তেজিত হয়ে অন্যপক্ষ তারা আখতার আহমেদ চৌধুরীকে মারার চেষ্টা করেছে। আমাদের পথে আটকানোর চেষ্টা করছে। ফোনে ধমক দিচ্ছে। যেখানে আমরা সশরীরে যাচ্ছি রংপুর। কে জানে কি হয়!

আখতার আহমেদ চৌধুরীকে জিগ্যেস করলাম,

ঢাকা থেকে গয়নাটা কিভাবে রংপুর গেল সে সম্পর্কে আপনার কি কোনো ধারণা রয়েছে?

গয়নাটা কি করে রংপুর গেল সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই কিন্তু ঢাকা যেমন অনেক প্রাচীন শহর তেমনই উত্তরবঙ্গের রাজাদের ইতিহাসও কিন্তু অনেক পুরনো।

এটা আমি জানি। নাটোরের রাজপ্রসাদ তার একটা উদাহরণ।

বললাম আমি।

শুধু নাটোরের রাজপ্রসাদ নয়, বগুড়ার নবাববাড়ি, রংপুরে রাজার বাড়ি- এইসব কিছু প্রমাণ করে উত্তরবঙ্গে এক সময় রাজাদের কী দোর্দন্ড প্রতাপ ছিল। মহারানী ভিক্টোরিয়াও একবার এই উত্তরবঙ্গে আসার কথা ভেবেছিলেন।

সেটা কতো সাল বলতে পারো?

ঠিক সাল বলতে পারবো না। তবে একশো বছরের কম হবে না।

তাহলে- ঢাকায় যে ছবিতে বিদেশী মহিলার গলায় হারটা দেখা যাচ্ছে তিনি কি কোনো কারণে রংপুরে এসেছিলেন?

আমি প্রচুর বই ঘেঁটেছি এই বিষয়ে। কিন্তু কোনো তথ্য পাইনি।

কিন্তু সে রকম না হলে গয়নাটার তো হেঁটে রংপুর আসার কথা নয়।

এতো দামি গয়না- হারিয়ে গেলেও তো সেই তথ্য ইতিহাসে থাকতো।

তাহলে? সত্যি সত্যি গয়নাটা ঢাকা থেকে রংপুর গেল কি করে?

কথাটা মুখ থেকে ফেলতে পারিনি। ঘটনাটা ঘটল তখনই। সামনে থেকে আসা ট্রাকটা সরাসরি আঘাত করলো আমাদের গাড়িটায়। সামনের সিটে বসে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ট্রাক ড্রাইভার ইচ্ছা করলে আমাদের গাড়িটার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু সেটা না করে সরাসরি আঘাত করেছে আমাদের গাড়িটায়। আমাদের ড্রাইভার ইদ্রিস মিয়া খুবই দক্ষ ড্রাইভার। এই অবস্থায় সবাই ভাবে সামনের গাড়িটা বোধহয় ভুলক্রমে আঘাত হানছে। কিন্তু ইদ্রিস মিয়া ঠিকই বুঝতে পেরেছিল- ইচ্ছা করে ট্রাকের ড্রাইভার আমাদের গাড়িটাকে আঘাত করতে চাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে সজোরে বাম দিকে কেটে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারলো বটে, কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে গাড়িটার চেহারা যা দেখলাম তাতে কষ্টই পেলাম। মাত্র কিছুদিন আগে ছোটকাকু এই গাড়িটা কিনেছেন। ট্রাক ড্রাইভার যদিও পালিয়ে গেছে ট্রাক নিয়ে কিন্তু ছোটকাকু সেই ট্রাকের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে বললেন,

কোটি টাকার জিটেনের গয়না পাই বা না পাই, এই গাড়ির দামের টাকা তোমাদের

কাছ থেকে আমি উদ্ধার করবোই।

সাত.

ঢাকা থেকে রংপুরের দূরত্ব ৩২৪ কিলোমিটার। স্বভাবিকভাবেই এতোদূর এসে পরিশ্রান্ত হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া রাস্তায় যে দুটো ঘটনা ঘটলো তাতে আরো বেশি ক্লান্ত হওয়ার কথা। ট্রাকের ধাক্কায় গাড়ির সামনের দিকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে গাড়িটি চলার উপযুক্ত থাকায় সেই ভাঙা গাড়িতেই আমরা রংপুরে পৌঁছেছি।

এর মধ্যে আখতার আহমেদ চৌধুরীর মোবাইল অনেকবার বেজেছে। সেই প্রাইভেট নাম্বার। একবার ফোনটা তোলা হয়নি। রংপুর শহর আর দশটা মফস্বল শহরের মতোই। আগেই শুনেছিলাম, ঢাকায় যেমন সোডিয়াম রয়েছে, রংপুরেও তেমন সোডিয়াম আছে। বগুড়া থেকে রংপুর পর্যন্ত প্রশস্ত পথ। পথের দু'পাশে ছোট টিলা। সবুজ ধানক্ষেত। সবকিছু মিলে খুব সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু সেগুলো কোনো কিছু দেখার মতো মন ছিল না। কারণ পরপর দুটো ঘটনা ঘটে যাওয়ায় ছোটকাকু এবং আখতার আহমেদ চৌধুরী যথেষ্ট গম্ভীর। ছোটকাকু আখতার আহমেদ চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করেছিল, যে বাসাটায় তিনি গিয়েছিলেন সেই বাসাটা রংপুর শহরেই কি না!

জবাবে আখতার আহমেদ চৌধুরী বলেছিলেন, রংপুর তার অতো ভালো করে চেনা নয়। তবে জায়গটা খুব সম্ভব বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের ওপরেই।

ছোটকাকু আখতার আহমেদ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করলেন এই হাইওয়ের উপরেই কোনো একটা হোটেলে তিনি উঠবেন। বগুড়া-রাজশাহী কিংবা রংপুর অঞ্চলে বেশির ভাগ আবাসিক হোটেলগুলোকে কেন জানি 'মোটেল' বলা হয়। মোটেল শব্দটা আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় রাস্তার পাশের আবাসিক হোটেলগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। খুব সম্ভব মোটর-ইন থেকে মোটেল শব্দটির উৎপত্তি। ধারণা করা হয়, এক সময় বিলেত থেকে প্রচুর লোক এই এলাকায় আসতেন বলে এই এলাকার হোটেলকে মোটেল বলা হয়। এই রকম একটা দোতলা মোটেল দেখে আমরা গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করলাম। কিন্তু হোটেলের রিসেপশনে গিয়ে রুম চাইতেই রিসেপশনিস্ট বলল,

জি স্যার, রুম রয়েছে।

দোতলায় পাশাপাশি দুটি রুম চাই।

জি স্যার, দেখছি পাশাপাশি খালি আছে কি না!

এই সময় মোটেলরই একজন সিকিউরিটি গার্ড এসে রিসেপশনিস্টের কানে কানে কিছু বলে। এর পরপরই রিসেপশনিস্টের চেহারা পাল্টে গেল। রেজিস্টার খাতাটা একটু নড়াচড়া করে বলল,

সরি স্যার, আগের থেকে একটা বুকিং ছিল। খেয়াল করিনি। আমাদের এখানে কামরা খালি নাই।

বুঝতে অসুবিধা হলো না আমাদের অদৃশ্য শত্রুপক্ষ এখানেও বাধার সৃষ্টি করে রেখেছে।

ছোটকাকু বললেন,

চলেন, আরেকটা মোটেলে থাকার চেষ্টা করা যাক। না হলে সোজা সার্কিট হাউজে থাকার চেষ্টা করবো। তবে পরের মোটেলটায় গিয়ে অতোটা হতাশ হতে হলো না। কারণ মোটেলের মালিক ছোটকাকুর পূর্ব পরিচিত। তিনি বললেন,

আপনার সম্পর্কে খুব কঠিন কথা বলে রেখেছে এখানকার রাজা সাহেব।

রাজাসাহেব? এই যুগে আবার রাজাসাহেব নামে কিছু আছে কি?

একটু চমকে আমি মোটেলের মালিকের দিকে তাকালাম। ছোটকাকু বললেন,

রাজাসাহেব আবার কে?

রাজাসাহেবের আসল নাম সোলেমান চৌধুরী।

আখতার আহমেদ চৌধুরী নামটা শুনেই বললেন,

এই সোলেমান চৌধুরীকে নিয়েই তো এতো ঘটনা। আমি তার কাছে এসেছিলাম। ছোটকাকু বুঝতে পারলেন- আখতার আহমেদ চৌধুরী এবং হোটেলের মালিক একই লোকের কথা বলছেন।

ছোটকাকু বললেন,

আপাতত মোটেলে দুটো কামরা দিন। আমরা ফ্রেশ হয়ে নিই। তারপর কথা হবে।

মোটেলের কামরাগুলো খুব খারাপ নয়। ছোটকাকু বললেন, ফ্রেশ হওয়ার জন্য খুব বেশি সময় নেয়া যাবে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে তোমরা সবাই আমার কামরায় আসো।

এতো ঘটনা। তারপরও ছোটকাকু কেন যে এতো সময় নিচ্ছে আমার মাথায় ঢুকছে না। গোসল করে কাপড় চোপড় পরে ছোটকাকুর কামরায় গিয়ে দেখলাম ছোটকাকু খুব মনোযোগ দিয়ে তার সবুজ খাতাটা খুলে বসেছে। আমাকে দেখে বললেন,

আখতার আহমেদ চৌধুরী কোথায়? তার কাছ থেকে অনেক কিছু জানার আছে।

এই সময় দরজায় নক করে আখতার আহমেদ চৌধুরী এবং হোটেলের মালিক একই সঙ্গে প্রবেশ করলেন। ছোটকাকুর ঘরের মধ্যে বড় দুটো সোফা রয়েছে। মোটেলের মালিক ইউসুফ আলী বললেন,

সোলেমান চৌধুরী রংপুরের বিখ্যাত জমিদার পরিবারের একজন বলে দাবি করে। এক সময় ঢাকার কয়েকটি চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। মজার ব্যাপার হলো, তিনি সবগুলো চরিত্রে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সে কারণেই রংপুরে তার নাম হয়েছে রাজাসাহেব। বলা হয় রংপুরের যে রাজপ্রাসাদ রয়েছে এই রাজপ্রাসাদের রাজাদের সাথেই সোলেমান চৌধুরীর পূর্বপুরুষদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

ছোটকাকু ইউসুফ খানকে থামিয়ে বলল,

এই কথাগুলো পরে শুনবো। কিন্তু তোমাদের এই চলচ্চিত্রের রাজাসাহেব এখন কি করে?

সেটা খুবই রহস্যময় ব্যাপার। চলচ্চিত্র জগতে আর সুযোগ না পাওয়ায় মাঝে মাঝে রাজাসাহেব রংপুরের এই বাড়িতে এসে থাকেন। আর মাঝে মাঝে হয়ে ওঠেন অদৃশ্য। তবে রাজাসাহেবদের রংপুরের মানুষদের ওপরে আছে দারুণ প্রভাব।

সেটা কেন?

নানা কারণে। শোনা যায়, রাজাসাহেবের কথা একবার একজন মানুষ শোনেনি বলে তার লাশ পাওয়া গিয়েছিল ধানক্ষেতে। আরো একবার এ রকম আরেক একটা ঘটনায় আরেক ভদ্রলোক এই ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের ওপরে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ঘটনা দুটোর পর রংপুরের লোকেরা সোলেমান চৌধুরীকে যথেষ্ট সম্মান করে চলে।

- সেজন্যেই বিভিন্ন মোটেলে তিনি মানা করে রেখেছিলেন আমাদের আশ্রয় না দেয়ার জন্য।

- ঠিক তাই। আমাদের এখানেও রাজাসাহেবের লোকেরা মানা করেছিলেন আমাদের রাখার ব্যাপারে। কিন্তু আপনি তো আমাকে চেনেন। অন্যায় কোনো কিছু মানতে আমার কষ্ট হয়।

- সেটা আমি জানি। তাই আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের কামরা দেয়ার জন্য। তবে আপনার কাছ থেকে আরো কিছু সাহায্য আমাদের লাগবে।

তার আগে তুমি বলো, যে জিনিসটার খোঁজে আমরা এখানে এসেছি সেটা রংপুরে কি করে আসলো সে সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?

আমি এতোক্ষণ খেয়াল করলাম

মানি গ্রাম
MoneyGram
International Money Transfers
বিশ্বখ্যাত মানিগ্রাম এর সহায়তায় বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে মাত্র কয়েক মিনিটে স্বদেশে অর্থ প্রেরণের সুবিধা
বিস্তারিত জানতে যে কোন শাখায় অথবা প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন
এন সি সি ব্যাংক লিমিটেড
NCC BANK
প্রধান কার্যালয় ঃ ৭-৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

আখতার আহমেদ চৌধুরী যে কাপড় পরে এসেছিলেন সেই কাপড়েই রয়েছেন। বরং আগের চেয়ে তাকে একটু উদ্‌ভ্রান্তের মত লাগছে। ছোটকাকু বুঝতে পেরেছেন নিজের কামরায় গিয়ে ফ্রেশ না হয়ে বরং গত কয়েক ঘন্টার বিভিন্ন ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে ভদ্রলোক ভেবেছেন।

আসলেই তাই। আখতার আহমেদ চৌধুরী বললেন, তিনি কামরায় গিয়ে ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো নিয়ে অনেক ভেবেছেন। ফোনে ঢাকায় কথা বলেছেন। তার সঙ্গে কাজ করে একটি ছেলের সঙ্গে। যে তথ্যগুলো আখতার আহমেদ চৌধুরী দিলেন তা যথেষ্ট বিস্ময়কর। তবে একটা প্রশ্ন আমার মনে থেকেই গেল, জিটেনের গয়নার সেটটা রংপুরে এক ভদ্রমহিলার গলায় ছবিতে দেখেছেন আখতার আহমেদ চৌধুরী দশ দিন আগে। সে ক্ষেত্রে এই তথ্যগুলো তিনি আগে কেন সংগ্রহ করেননি?

আট.

একটু আগে মোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমরা মোটেল মালিক ইউসুফ আলীর সাদা মাইক্রোবাসে চড়ে রওনা দিয়েছি। গতকাল পুরো দিন আমরা সবাই মোটেলে ছিলাম। আমি কয়েকবার ছোটকাকু আর আখতার আহমেদ চৌধুরীর কামরায় গিয়েছি। ছোটকাকু যথারীতি ল্যাপটপ আর সবুজ খাতাটা নিয়ে ব্যস্ত। আর আখতার আহমেদ চৌধুরী ঢাকা থেকে অনেকগুলো বই আনিয়েছে। সেই বইগুলোর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রয়েছে। নিচের হোটেলে রিসেপশনের কাছে একবার গিয়েছিলাম। তখন ইউসুফ আলী বললেন,

- রাজাসাহেবের লোকেরা তাকে একবার ধমক দিয়ে গেছে। তিনি বলেছেন ছোটকাকু তার পূর্বপরিচিত। এইজন্য বাধ্য হয়ে তাকে আশ্রয় দিতে হয়েছে। তবে কথা দিয়েছেন তিনি রংপুরে থাকা অবস্থায় মোটেলের বাইরে বেরুবেন না। এই কথা বলে ইউসুফ আলী রাজাসাহেবের লোকদের কাছ থেকে রক্ষা পেয়েছে। তবে রাজাসাহেবের লোকেরা হোটেলের বাইরে থেকে বা লবিতে এসে লক্ষ্য রাখছে আমরা কি করি!

ছোটকাকু গতকাল এই পড়াশোনার ফাঁকে বহুবার আখতার আহমেদ চৌধুরীর কামরায় গেছেন। কয়েকবার আমিও ছিলাম। ছোটকাকু বারবারই একটা জিনিসের ওপর জোর দিচ্ছিলেন। একশো বছর আগে ঢাকায় বিদেশীর গলায় যে জিটেনের গয়না ছিল সেটা সত্যি সত্যি রংপুরে যে ছবিটা আমরা দেখেছি সেটা একই কি না! আখতার আহমেদ চৌধুরী ঢাকায় বলেছেন তিনি একদম নিশ্চিত একই গয়না এটি! সে ব্যাপারে অবশ্য ছোটকাকুও নিশ্চিত। কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকে যাচ্ছে, ঢাকা থেকে গয়নাটা এলো কি করে?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যেই আখতার আহমেদ চৌধুরী ঢাকা থেকে কিছু বইপত্র আনিয়েছেন। ছোটকাকুও নানা রকম পড়াশোনা করছেন। উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। বিকেল চারটার দিকে ছোটকাকু আর আখতার আহমেদ চৌধুরী দেখলাম কিছু বই, ল্যাপটপ সব নিয়ে এক সাথে বসেছেন। ছয়টার দিকে ছোটকাকু আমাকে ডাকলেন। বললেন,

একটা সিদ্ধান্তে বোধহয় আসা গেছে। প্রচুর বই ঘেঁটে ইন্টারনেটের নানা ওয়েবসাইট খুঁজে গত কয়েক ঘন্টায় তারা দেখেছেন এক সময় বাংলাদেশের এখন যে ভৌগোলিক অবস্থা সেদিকে তাকালে দেখা যায় ঢাকা যেমন খুব প্রাচীন নগরী, তেমনই রংপুরের এই অঞ্চলে সভ্যতার নিদর্শন এসেছে অনেক আগে। রংপুরে তাজহাট বলে স্থানে যে রাজার বাড়িটা রয়েছে সেটি হলো রায় বংশের রাজা। রায় বংশের রাজাদের ইতিহাস পড়লে জানা যায় এই বংশের ছেলেরা রাজা হলেও পড়াশোনার ব্যাপারে এদের ছিল দারুণ আগ্রহ।

ফলে যেই রাজা হয়েছে তাদের বেশির ভাগকে দেখা গেছে বিলেত থেকে পড়াশোনা করে এসেছে। এই তথ্যটার উপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দিলেন আখতার আহমেদ চৌধুরী এবং ছোটকাকু। এই জোর দেয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো যে বিদেশী ভদ্রমহিলা ঢাকায় এসেছিলেন তার সাথে পড়াশোনা করেছে কিংবা তার চেনা কেউ রংপুরের এই রাজবংশের প্রতিনিধি। তারই নিমন্ত্রণে হয়তো ভদ্রমহিলা রংপুর গিয়েছিলেন।

এইটুকু জানার পরে আমি বললাম,

- এইটুকু হলেও হতে পারে। কিন্তু রংপুরে এসে বিদেশী ভদ্রমহিলা তার এতো দামি গয়নার সেটটা কাউকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন সেটা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে হচ্ছে না।

আমরা উপহার দেয়ার কথা একদমই ভাবছি না। তাছাড়া উপহার দিয়ে গেলে তিনি যেটা দিয়েছেন নিশ্চয়ই কোনো এক রাজাসাহেবকে। সেটা রাজাসাহেবের কাছে কেন দিলেন তার আমি কোনো কারণও খুঁজে পাচ্ছি না।

আখতার আহমেদ চৌধুরী কথাটা বলার পর ছোটকাকু বললেন,

আমিও ভাবছিলাম বিদেশী ভদ্রমহিলা গয়নাটা কাউকে উপহার দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাহলে গয়নাটা রংপুরে এই সিনেমার রাজা সাহেবের পরিবারে রয়ে গেল কিভাবে?

এইটুকু বলতে না বলতেই ছোটকাকু হঠাৎ করে আখতার আহমেদ চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললেন,

আচ্ছা তুমি না আমাকে একবার বলেছিলে রংপুরে একবার নাকি ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছিল।

হ্যাঁ- ১৮৯৭ সালে এই অঞ্চলে ভয়াবহ একটা ভূমিকম্প হয়েছিল।

সেই ভূমিকম্পে গাছপালা, বাড়িঘরের ক্ষতি তো হয়েছিলই, তখন এই অঞ্চলের রাজা ছিলেন রাজা গোবিন্দলাল রায়। তার রাজপ্রাসাদটাও ভেঙে পড়েছিল আর নিজেও গুরুতর আহত হয়েছিলেন।

রাজার সেই বাড়িটার কি অবস্থা?

বাড়িটা খুব সম্ভব এখনো ধ্বংসস্তূপ হয়ে রংপুরেরই কোথাও রয়েছে।

সেখানে আমাদের যেতে হবে। কিন্তু তার আগে আরো একটা প্রশ্ন। গাড়ির ছবির বিদেশী ভদ্রমহিলা এসেছিলেন কবে?

১৯০৪ বা ৫-এ।

ছোটকাকুর কথায় কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্প। ১৯০৪ সালে ভদ্রমহিলার আসা। আবার ঐ ভাঙা রাজবাড়িটা দেখতে ছোটকাকু যাবেন। সব মিলিয়ে পুরো ঘটনাটা জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ইউসুফ আলীকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন,

পুরনো রাজবাড়িটা নদীর পাড়ে এখনো ধ্বংসস্তূপ হয়ে রয়ে গেছে। কিন্তু রাতের বেলা কিছুই দেখা যাবে না। দেখতে হলে যেতে হবে সকাল বেলা। ফলে সকালের প্রতীক্ষা। কিন্তু রাতে আমি ঘুম থেকে উঠে কয়েকবার দেখেছি- আখতার আহমেদ চৌধুরী এবং ছোটকাকু দু'জনেই একসঙ্গে পড়াশোনা করছেন। সকালবেলা ইউসুফ আলী নাশতার পরে জানিয়েছেন- রাজাসাহেবের দু'জন লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। ছোটকাকু সব শুনে বললেন,

মোটেলের অন্য কোনো দরজা দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাবো।

ছোটকাকু সাধারণত এ ক্ষেত্রে এ রকম ব্যাপার করেন না। বুঝতে পারছি ছোটকাকু এই মুহূর্তে কোনো ঝামেলা চাচ্ছেন না। সুতরাং মোটেলের পেছন দিক দিয়ে নীরবে ইউসুফ আলীর গাড়িতে চড়ে আমাদের বেরিয়ে যাওয়া। গাড়ির কাচে কালো কাগজ দেয়া আছে। কেউ আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু আমরা সবই দেখছি। মোটেলের বাইরে দু'জন জিন্স পরা। জিনসের (এই আরেকটা শব্দের নীরব বিপ্লব। কারণ জিনস হলো একটা কোম্পানির নাম। আর ডেনিম হলো কাপড়ের নাম) কাপড় পরা দু'জন লোক

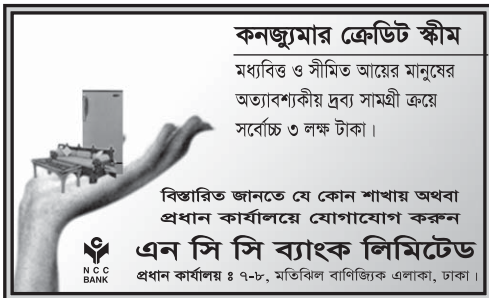

দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের ভাঙা গাড়িটার সামনে। দুটো লোকের হাবভাবই বলে দিচ্ছে একেবারেই অকারণে সময় কাটাচ্ছে ওরা।

মোটেল থেকে দশ-পনেরো কিলোমিটার দূরেই একটা নদী। নদীর এপার থেকে ওপারে দেখা যায় ঘন সবুজ ঘন গাছের ঘন জঙ্গল। এপার থেকে দেখা যায় জঙ্গলের মধ্যে সরু একটা পথ। সেই পথটা গিয়ে ঠেকেছে প্রায় ধ্বংসস্তূপ একটা বাড়িতে। বলা বাহুল্য, এটাই সেই রাজা গোবিন্দলাল রায়ের রাজপ্রাসাদ।

ভাবতে অবাক লাগে, এক সময় এই রাজপ্রাসাদের মানুষগুলো কেমন কর্মচঞ্চল ছিল। কিন্তু একটা বড় ধরনের ভূমিকম্পে সবকিছু কেমন ধ্বংস হয়ে গেছে। ইউসুফ আলী বললেন,

এই নদীর পাড়েই নতুন রাজা এর কয়েক বছর পরে আরেকটি রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন।

সেই রাজপ্রাসাদটা কোথায়?

এখানেই একটা মজা রয়েছে। এই যে, ঠিক যে জায়গাটায় আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেখান থেকে দুটো রাজপ্রাসাদ দেখা যায় না। কিন্তু আপনি যদি নদীর ঐ পাড়ে ভাঙা রাজপ্রাসাদটার কাছে গিয়ে দাঁড়ান তাহলে দুটো রাজপ্রাসাদই দেখতে পাবেন। প্রাচীন যুগের এ রকম অনেক স্থাপত্যের উদাহরণ আমি জানি। সে সময় অনেক নির্মাতা ছিলেন যারা স্থপতি নন কিন্তু দারুণ সব জিনিস তৈরি করে গেছেন। শুনেছি, তাজমহলের যে আটটা মিনার রয়েছে সেগুলো এমনভাবে তৈরি যে সেগুলো দূরের যেকোনো দিক থেকে দেখলেই সবগুলো মিনারকে একই সমান দেখায়। সেই রকম এখানেও যে রাজপ্রাসাদ রয়েছে সেখানেও এ রকম কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে যাতে একদিক থেকে একটা প্রাসাদ দেখা যায় আরেকদিক থেকে দুটো।

আমি যে কথাটা ভাবছিলাম, আখতার আহমেদ চৌধুরীও বোধহয় সে রকমই কিছু ভাবছিলেন। কারণ তিনি বললেন,

এই ব্যাপারটাও আমি কোনো একটা বইয়ে পড়েছিলাম। রাজা গোবিন্দলালের ছেলে গোপাললাল রায় এই নতুন রাজপ্রাসাদটা তৈরি করেছিলেন। যেহেতু তার বাবা ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদে থেকে আহত হয়েছিলেন সে জন্য গোপাল লাল রায় চাইতেন তার প্রাসাদে যারা আসবে তারা যেন একই সাথে পুরনো প্রাসাদটাও দেখতে পায়।

নতুন প্রাসাদটা রাজা গোপাল রায় কবে তৈরি করেছিলেন?

আখতার আহমেদ চৌধুরী নয় ইউসুফ আলী বললেন,

যখন ভূমিকম্প হয় আমি শুনেছিলাম উনি ছিলেন বিলাতে। বাবার দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দেশে ফিরে আসেন তিনি। তারপর আর বিদেশ যাননি।

ইউসুফ আলীর কথা শোনার পর কেন জানি ছোটকাকু আর আখতার আহমেদ চৌধুরী খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং বললেন, এখনই তারা আবার মোটেলে ফিরে যেতে চান। যদিও দু'জনের মুখ খুব গম্ভীর। কিন্তু কেন জানি আমার মনে হলো ছোটকাকুর চোখে কেমন একটা আশার আলো। একই সাথে হঠাৎ করেই চোখে পড়লো রংপুরের আকাশে একটা রংধনু। কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। তারপর সূর্য উঠেছে। কিন্তু আমরা আজ বৃষ্টির দেখা পাইনি। সূর্যের নয় রংপুরের আকাশে শুধু দেখছি একটা রংধনু।

নয়.

আমি আমার ঘরে বসেই টের পেয়েছি রাতভর ছোটকাকু নানা জিনিস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। টেলিফোনে কথা বলেছেন। আখতার আহমেদ চৌধুরীকে ডেকে নিয়ে গেছেন তার ঘরে কয়েকবার। কিন্তু সকালে ছোটকাকুকে দেখে মনে হলো বেশ উৎফুল্ল তিনি। কিছুটা ফ্রেশও বটে। তবে মোটেলের নিচের তলার রেস্টুরেন্টে আমি পৌঁছে দেখলাম ছোটকাকু, আখতার আহমেদ চৌধুরীর সঙ্গে আরো একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। ছোটকাকু পরিচয় করিয়ে দিলেন নতুন ভদ্রলোক জুলফিকার হাওলাদারের সঙ্গে। হাওলাদার সাহেব রংপুর সদর থানার ওসি। আমি আসার আগে থেকেই উনারা কথা বলছিলেন। তাই পরিচয়ের পর ছোটকাকুর দিকে ঘুরে হাওলাদার সাহেব বললেন,

আপনারা যেভাবে বলছেন, রাজাসাহেবকে কিন্তু সে রকম খারাপ লোক বলে মনে হয় না।

আপনার কথা হয়তো ঠিক। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক রাজসাহেব আমাদের সঙ্গে খুব একটা ভালো ব্যবহার করেননি।

ছোটকাকুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি বললাম,

ভালো ব্যবহার মানে? রাজাসাহেবের ব্যবহারে রীতিমতো আমাদের জীবন যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমি ওসি সাহেবকে ঢাকা থেকে রংপুর আসার ঘটনা দুটো বললাম। ওসি সাহেব কথাটা শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন,

রাজাসাহেবের ভাইয়ের মেয়ে আর আমার এক বোন একই সঙ্গে পড়ে। আমি বরং আমার বোনকে বলি, রাজাসাহেবের ভাইয়ের মেয়েকে নিয়ে এখানে আসতে।

আমরা এসেছি রাজাসাহেবের কাছে। তার ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে আমাদের কোনো কথা নেই। হঠাৎ করেই দেখলাম, আখতার আহমেদ চৌধুরী উত্তেজিত হয়ে গেছেন।

রাজাসাহেবের ভাইয়ের মেয়ে আসবে তা নিয়ে আখতার আহমেদ চৌধুরীর এতো উত্তেজিত হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। ছোটকাকুও ব্যাপারটা গ্রাহ্য না করে বললেন, ঠিক আছে তাকে আসতে বলুন।

জুলফিকার হাওলাদারের মোবাইলে ফোন পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম দুটো মেয়ে লবিতে প্রবেশ করছে। এদের মধ্যে একজনকে আমি দেখেই চিনতে পারলাম। রাজাসাহেবের সঙ্গে ছবিতে যে চারজন ছিল তাদের মধ্যে ক্রেস্ট হাতে যে মেয়েটি রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিলেন- সেই মেয়েটি এখন লবিতে।

লবির সোফায় গিয়ে আমরা বললাম। মেয়েটি আখতার আহমেদ চৌধুরীকে দেখেই বললেন,

- আপনি এখানে আছেন জানলে আমি আসতাম না।

মেয়েটির কথা শুনে অবাক হলাম। কারণ, আখতার আহমেদ চৌধুরীকে আমার বরাবরই খুব মাই ডিয়ার লোক মনে হয়েছে। মফস্বল শহরের একটি মেয়ে তাকে এভাবে কথা বলবে এটা আমার মোটেও পছন্দ নয়। বললাম,

আপনি জানেন, যার সম্পর্কে বলছেন আপনি তিনি একজন খ্যাতিমান ভদ্রলোক।

খ্যাতিমান হয়তো হতে পারেন তিনি কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে রকম পরিচয় সেটা মোটেও খুব সুখকর স্মৃতি নয়।

এবার ছোটকাকু বললেন, ভদ্রলোক একবার তোমাদের রংপুরের বাসায় গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ- কয়েকদিন আগে তিনি আমাদের বাসায় এসেছিলেন। সেখানেই এসে সবকিছু লন্ডভন্ড করে দেন।

সেটা কি রকম?

প্রথমে তিনি এসে বলেছিলেন তিনি একজন সাংবাদিক। আমার সঙ্গে পুরস্কার পাওয়া নিয়ে কথা বলতে চান। পরে আমার চাচার সঙ্গে ঐ একই দিনে আবার কি নিয়ে কথা হলো, দেখলাম চাচা খুব উত্তেজিত। এবং এই ভদ্রলোক যাবার পর আমার চাচা পুরো বাড়ি তছনছ করে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন! ছোটকাকু এই কথার পর আখতার আহমেদ চৌধুরীর দিকে তাকালেন। দেখলাম তিনি একটা সোফায় কেমন যেন মাথা নিচু করে বসে আছেন।

ছোটকাকু তার দিকে এগিয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে কিছু কথা বললেন। তারপর আবার আমাদের কাছে ফিরে এলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন,

আখতার যখন পত্রিকায় রংপুরের এই ছবিটা দেখল তখন তার কাছে গয়নার দামের চেয়েও বড় হয়ে গিয়েছিল এই রকম একটা আবিষ্কারের ব্যাপার। বিলেতের এক মহিলার গলার গয়না শোভা পাচ্ছে রাজাসাহেবের কোন বংশধরের গলায়। এই আবিষ্কারের কারণে একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে সাংবাদিক পরিচয়ে রাজাসাহেবের বাড়িতে এসে যথেষ্ট হইচই করেছিল আখতার। যে হইচইটা এই মেয়েটির পছন্দ হয়নি। আর রাজাসাহেব বুঝতেই পারেনি আখতারের উদ্দেশ্য গয়নাটা নিয়ে যাওয়া নয়, আখতারের আগ্রহ গয়নার ইতিহাসে।

ছোটকাকুর কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম আখতার আহমেদ চৌধুরী কেন রাজাসাহেবের ভাইয়ের মেয়ের এখানে আসার ব্যাপারে আপত্তি করছিলেন। আখতার আহমেদ চৌধুরী সব কথাই ঠিক বলেছে। শুধু এড়িয়ে গেছে একটা কথাই। রাজাসাহেবের বাড়িতে তিনি রাজাসাহেবের সঙ্গে আলাদা একটা মিটিং করেছেন। রাজাসাহেব প্রথম দিকে আখতার আহমেদ চৌধুরীকে সাংবাদিক হিসাবে খাতির করেছেন কিন্তু জিটেন গয়নার ব্যাপারটা মোটেও বিশ্বাস করেননি। পরে আখতার আহমেদ চৌধুরীর কাছে ছবি দেখে রাজাসাহেব বুঝতে পারেন, সত্যি সত্যি জিটেন গয়নাটা খুবই দামি গয়না এবং তার ড্রইংরুমে তিন পুরুষ আগের যে খালার গলায় হারটা শোভা পাচ্ছে সেটা পেলে তারপরের তিন পুরুষের আর দুঃখ থাকবে না। তবে রাজাসাহেব একটা কথা বুঝতে ভুল করেছিলেন। তিনি বরাবরই মনে করেছেন আখতার আহমেদ চৌধুরী আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো দামি গয়নার লোভে ঢাকা থেকে রংপুরে এসেছেন।

রাজাসাহেব এক সময় সিনেমায় অভিনয় করতেন। সেই সুবাদে তার ঢাকায় নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল। তখন ঢাকায় তার কিছু খারাপ বন্ধু-বান্ধব জুটেছিল। রাজাসাহেব যিনি মানুষটা খুব খারাপ নন কিন্তু দামি গয়নার লোভে সেই পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করলেন। বললেন, এ রকম আখতার আহমেদ চৌধুরী নামে একজন গয়নার লোভে বাড়িতে এসেছিলেন। তাকে একটু ভয় দেখাতে হবে। সেটা নিয়েই এতো কান্ড। আখতার সাহেবের ফোনে ভয় দেখানো সব ফোন আসতে লাগলো। কিন্তু তারপর যখন সত্যি সত্যি আখতার সাহেব আমাকে নিয়ে রংপুরে রওনা দিলেন তখন রাজাসাহেব সত্যি ভয় পেলেন। পুরো বাড়ি তছনছ করে যদিও তিনি জিটেন গয়নার কোনো হদিশ করতে পারেননি কিন্তু এটাও বিশ্বাস করতে পারেননি আখতার আহমেদ চৌধুরীর আগ্রহ সত্যিকারের গয়না নয়, গয়নার ইতিহাসে। এই সবগুলো কথাই আমি শুনছিলাম রাজাসাহেবের ভাইয়ের মেয়ের মুখ থেকে।

মোটেলের লবিতে ছোটকাকুর কৃতিত্বে এবং সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলার ফলে একটা জিনিস রাজাসাহেবের ভায়ের মেয়ে বুঝতে পারল, আখতার আহমেদ চৌধুরী মানুষটি ততো খারাপ নয় যতোটা সে ভেবেছে। তাছাড়া জিটেন গয়নাটার কথাই সে জানতো না। এর মধ্যে একটা কথা অবশ্য আমি বুঝে গেছি- জেটটেনের গয়নার সেটটা যদি পাওয়া যায় আর সেই গয়নাটা যদি উত্তরাধিকারী সূত্রে কেউ দাবিদার হতো তাহলে সেটার দাবিদার অবশ্যই এই মেয়েটি।

জুলফিকার হাওলাদার এক কাপ চা খাওয়ার পর বললেন,

আমার মনে হয় এই জেটটেনের গয়নাটা কোথায় আছে সেটা জানার জন্য আমাদের সবার এখন রাজাসাহেবের বাড়িতে যাওয়া উচিত।

কিন্তু রাজাসাহেব সবকিছু নিয়ে যেভাবে ভুল বুঝে আছেন তাতে আপনাকে নিয়ে রাজাসাহেবের বাড়িতে রওনা দিলে তিনি মনে করবেন, আমরা পুলিশ নিয়ে তার বাড়ির দিকে যাচ্ছি।

কথাটা অবশ্য তুমি মন্দ বলোনি!

জুলফিকার হাওলাদার বললেন, তাহলে এক কাজ করা যাক! আপনারা যেভাবে সকালে মোটেলের পেছনদিক দিয়ে বেরিয়েছেন সেভাবেই যান আর আপনাদের ফোন পেলে আমি পরে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে যোগ দেবো।

জুলফিকার হাওলাদারের পরামর্শ মতো তাই করলো ছোটকাকু। আমরা বিনা বাধায় গিয়ে পৌঁছলাম রাজাসাহেবের বাড়িতে। ভদ্রলোককে সামনা-সামনি দেখে মনে হলো, তার অভিনীত দু-একটা ছবি আমি টেলিভিশনে দেখেছি।

দশ.

ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাওয়া রাজার এই প্রাসাদে গত দু'দিনে কতোবার এসেছি, কতোক্ষণ ছিলাম কিছুই বলতে পারবো না। ছোটকাকু যখনই বলেছেন আমরা যাচ্ছি ভাঙা প্রাসাদে। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। পুরনো রাজপ্রাসাদ। ছোট ছোট ইটের তৈরি। পুরো বাড়িটার অনেক অংশই মাটির নিচে চলে গেছে। যে অংশ মাটির উপরে রয়েছে সেটাও ভাঙাচোরা। দু'দিন পর আজ বিকেলে জুলফিকার হাওলাদার বলেছেন, জিটেনের গয়নাটা আর বোধহয় খোঁজার দরকার নেই। কারণ সেটা যদি বাইরে থাকতো তাহলে আমরা এতোদিনে পেয়ে যেতাম। আর বাড়ির ভেতর কোথাও যদি সেটা থেকে থাকে তাহলে এই বাড়ির প্রত্যেকটা ইট খোলা সম্ভব নয়।

জুলফিকার হাওলাদার কথাটা ভুল বলেননি। কারণ গত দুই দিন ধরে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যতোটুকু মন দিয়ে দেখা সম্ভব দেখেছি। শুধু তাই নয়, রংপুর পুলিশের দশজন পুলিশও আমাদের সঙ্গে সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু জিটেন পাথরের গয়না তো দূরের কথা, কোনো কিছুরই খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আমাদের মধ্যে এই জিটেন পাথরের গয়নার জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহ যে দু'জনের আখতার আহমেদ চৌধুরী এবং রাজাসাহেব তাদেরও মনে হয় এই দু'দিনে খোঁজার উৎসাহে ভাটা পড়েছে। কিন্তু ছোটকাকু কিছুতেই মানতে রাজি নন ব্যাপারটা।

দু'দিন আগে আমরা প্রথম যখন রাজাসাহেবের বাড়িতে যাই তখন রাজাসাহেব প্রথম আমাদের দেখে খুবই রাগ করেছেন। কিন্তু পরে থানার ওসি জুলফিকার হাওলাদার এবং তার ভাইয়ের মেয়ে আমাদের সম্পর্কে সবকিছু বলার পরে রাজাসাহেব কিছুটা শান্ত হলেন।

আমরা যেই ড্রইংরুমে গিয়ে বসলাম সেই ড্রইংরুমটায় রাজাসাহেব এবং অন্যদের তোলা ছবিটা রয়েছে। ড্রইংরুমের পেছন দিকে সেই বড় ছবিটা রাখা। সালোয়ার-কামিজ পরা এক ভদ্রমহিলার গলায় জেটটেন পাথরের মালা। পত্রিকার ছবিতে অতো স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু এখানে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বিদেশী মহিলার পুরো গয়নাটাই এই মহিলা পরে আছেন। রাজাসাহেব বললেন, এই মহিলা তিন পুরুষ আগের তার এক খালা। ছোটকাকু জানতে চাইলেন, পূর্বপুরুষদের মধ্যে ড্রইংরুমে শুধু কেন এই খালার ছবি ঝুলিয়ে রেখেছেন।

আমাদের পূর্বপুরুষদের একজন ছিলেন খুব বড় আঁকিয়ে। শুনেছি, পারস্য দেশে প্রায়ই তাকে নিয়ে যাওয়া হতো ছবি আঁকার জন্য। হয়তো তার কারণেই আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রচুর ছবি রয়ে গেছে আমাদের বাসায়। ফলে মাঝে মাঝেই আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের ছবি এই ড্রইংরুমে ঝুলিয়ে রাখি।

এই জায়গাটায় আসলে কয়েক দিন আগেও ঝুলছিল আমার দাদার ছবি। কিন্তু বিবিসির পুরস্কার পাবার পর যখন লোকেরা ছবি তুলতে এলো তখন আমি চিন্তা করলাম এখানে যদি আমাদের কোনো পূর্বপুরুষদের

এনসিসি ব্যাংক হাউজিং লোন

NCC BANK

সহজ ও সাশ্রয়ী
সুদের হার মাত্র ১২%

যোগাযোগ করুন :
ধানমন্ডি শাখা-ফোন ৮১১০৫১৮, **গুলশান শাখা**-ফোন ৮৮১৮০৯৩
উত্তরা শাখা-ফোন ৮৯৫৬৪৮৭, **মিরপুর শাখা**-ফোন ৮০১৮০৩৬

ছবি থাকে তাহলে মন্দ হয় না। সেই জন্যেই আমি পড়ে থাকা ছবির স্তূপ থেকে এই ছবিটা লাগিয়েছি। ভদ্রমহিলার হাসি শুধু নয়, গয়নার সেটটাও খুব সুন্দর লেগেছিল আমার।

এই পর্যন্ত বলে থামলো রাজাসাহেবের ভাইয়ের মেয়ে। ছোটকাকু তার দিকে তাকিয়ে বললেন,

কিন্তু আরেকটা জিনিস কি তোমরা কেউ খেয়াল করেছো?

'কি সেটা?

জিগ্যেস করলেন আখতার আহমেদ চৌধুরী।

এটা তোমারই খেয়াল করা উচিত ছিল। কারণ তুমিই বলেছো, রংপুর অঞ্চলে বাঙালির ঐতিহ্য অনেক পুরনো।

হ্যাঁ- তাতো বটেই।

তাহলে ছবির এই ভদ্রমহিলার পরনে শাড়ি না থেকে সালোয়ার-কামিজ কেন? রাজাসাহেবের তিন পুরুষ আগের পূর্বপুরুষ নিশ্চয়ই বাঙালি ছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আখতার সাহেবের মতো এতো বড় মানুষ লাগবে না? আমি বলতে পারি।

রাজাসাহেব বললেন।

আপনার কি ধারণা?

ধারণা নয়, আমার কথাটাই সত্যি। আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেকে কাজ করতেন এখানকার রাজার বাড়িতে। আর রাজার বাড়িতে সাধারণত পোশাক হিসাবে মহিলারা সালোয়ার-কামিজই ব্যবহার করতো।

তার মানে আপনার পূর্বপুরুষদের অনেকে রাজার বাড়িতে কাজ করেছে।

শুধু আমাদের নয়, রংপুরের অনেক পরিবারই রয়েছে যাদের পূর্বপুরুষরা এক সময় রাজার বাড়িতে কাজ করতো।

যেখানে আপনাদের ছবিগুলো রাখা আছে সেগুলো কি আমি দেখতে পারি? সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে কেন জানি চলে গেলেন ছোট কাকু।

নিশ্চয়ই।

ছোটকাকু, আমি আর আখতার সাহেব একটা ঘরে গেলাম।

বোঝাই যায় এই ঘরে জিনিসপত্রগুলো খুব অযত্নে- অবহেলায় রাখা আছে। তারই মধ্য থেকে একটার পর একটা ছবি দেখা শুরু করছেন ছোটকাকু আর হাওলাদার। আখতার সাহেব আর আমি ছবি না দেখে দেখলাম, দু'জন মানুষ কী আগ্রহ ভরে পুরনো দিনের ছবিগুলো দেখছে। শুধু ছবির সামনের দিক নয়, ছবির পেছন দিকও তারা দেখছে। বুঝলাম, সেখানেও কিছু লেখা রয়েছে। প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক খোঁজাখুঁজির পর তিনটা ছবি বের করে এনে ছোটকাকু ড্রইংরুমে এলেন। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে : একটা ভাঙা বাড়ি। বেশ কিছু মানুষ দৌড়াদৌড়ি করছে।

ছোটকাকু বললেন,

কিছু বুঝতে পারছো? লোকগুলো কেন দৌড়াদৌড়ি করছে?

আমি বললাম,

ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনো একটা কারণে ভয় পেয়ে লোকগুলো দৌড়াচ্ছে।

ঠিক তাই। আর ভয়ের কারণটাও কিন্তু বোঝা যাচ্ছে।

সেটা কিভাবে?

এই যে দেখো, গাছটা নিচে পড়ছে-

তাহলে কি এটা কোনো ঝড়ের ছবি!

আমার তা মনে হয় না! কারণ অন্য গাছের ছবিগুলো দ্যাখো। কেমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া দূরে আরো একটা বাড়ি ভেঙে পড়ছে দেখা যাচ্ছে-

তুমি কি বলছো এটা কোনো ভূমিকম্পের ছবি?

ঠিক তাই।

আখতার আহমেদ চৌধুরী তার বসার জায়গা থেকে উঠে এসে ছবিটা হাতে নিলেন। তারপর ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখা শুরু করলেন।

মনে হচ্ছে ১৯০৪ বা ১৯০৫-এর ছবিটা।

তুমি ঠিকই বলেছো। আমিও তাই অনুমান করেছিলাম। ১৮৯৭ সালের বড় ভূমিকম্পের পর আরো একটা ছোট ভূমিকম্প হয়েছিল রংপুরে।

এ কথা আমি জানি। কিন্তু সেই ভূমিকম্পে এমন কোনো ক্ষতি হয়নি। এই ধরনের ছোট ভূমিকম্প মাঝে মাঝেই হয়। ইতিহাসে তার উল্লেখ থাকে না।

সবকিছুই ইতিহাসে থাকে না। আমাদের জীবনেও অনেক কথা থাকে।

ছোটকাকু বললেন আখতার আহমেদ চৌধুরীর কথায়।

মানে-

ছবিটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, অনেকগুলো মানুষের মধ্যে এই যে এখানটায় দ্যাখো-

আমিও তাকালাম ছবিটার দিকে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ছবিতে স্কার্ট পরা একজন বিদেশী মহিলাকে দেখা যাচ্ছে।

ছোটকাকু বললেন,

আমি নিশ্চিন্ত। তুমি যদি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দ্যাখো তবে দেখবে ঐ মহিলার গলায় জিটেন পাথরের গয়নাটা রয়েছে।

আমি ছোটকাকুর মুখের দিকে তাকালাম। এরপর ছোটকাকু যা বলে গেলেন আমি প্রায় তাই ভেবেছিলাম রাজা গোপাল লাল রায় যখন বিদেশে পড়াশোনা করেছেন তার সঙ্গে ঢাকায় যে বিদেশী মহিলা এসেছিলেন তার সঙ্গে আলাপ ছিল। সেই সুবাদেই মহিলার ঢাকা থেকে রংপুর আগমন। রংপুরে তখন রাজা গোপাল লাল রায় নতুন রাজপ্রাসাদ তৈরি করেছেন। সেই রাজপ্রাসাদ থেকে দেখা যায় পুরনো রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ। কেমন গা ছমছম করে দেখে। আবার সেই রাজপ্রাসাদ যখন বিধ্বস্ত হয় তখন অনেকের সঙ্গে স্বয়ং রাজাও আহত হয়েছিলেন। সেই সময় যখন ছোট আকারে একটা ভূমিকম্প হলো তখন স্বাভাবিক কারণেই সেই বিদেশী মহিলাও প্রচন্ড ভয় পান। এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পথে নেমে এসেছিলেন। শিল্পী এই ছবিটা দেখেছেন এবং কল্পনা করে এই মহিলার পাশে বাকি লোকগুলোকে সাজিয়েছেন।

ছোটকাকুর এই কথাটা মনে হওয়ারও একটা কারণ রয়েছে। যদি ভূমিকম্পের ভয়ে সত্যি সত্যি মানুষ দৌড়াতো তাহলে সবার চোখের দৃষ্টি এই ভদ্রমহিলার দিকে থাকতো না। শিল্পী কল্পনায় ভদ্রমহিলার দৌড় দিতে দেখেছেন বলে শিল্পীর মতো অন্য মানুষের দৃষ্টিও ভদ্রমহিলার দিকে। কেউ ভয় পেয়ে দৌড়ালে কখনো অন্যের দিকে তাকায় না।

জুলফিকার হাওলাদার বললেন,

অবশ্য এর আরেকটা কারণও থাকতে পারে।

সেটা কেমন?

আমি পুলিশ তো- তাই আমার মনে সন্দেহটা আগে আসে।

শিল্পী হয়তো বিদেশী মহিলাকে নয়, খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন তার দামি গয়নাগুলো।

আপনার কথাও সত্যি হতে পারে।

ছোটকাকু বললেন, কিন্তু আখতার এই ছবিটা দ্যাখো। এটা দেখে তোমার কেমন মনে হয়?

ছবিটা আমিও দেখলাম। একজন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার ছবি। ভদ্রমহিলার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়- দেয়ালে ঝোলানো ভদ্রমহিলার অল্প বয়সের ছবি এটি। কারণ মহিলার ঠোঁটের নিচের বড় একটা তিল দুটো ছবিতেই রয়েছে।

রাজাসাহেব বললেন,

এই ছবিটা আমার তিন পুরুষ আগের- খালা-খালুর।

আসলে কিন্তু এরা আপনার খালা-খালু নয়।

সেটা আমিও জানি। কিন্তু সেজন্যেই আমি তিন পুরুষ আগের শব্দটা ব্যবহার করি। ছোটবেলায় আমার মা মারা গিয়েছিল। আমি খালার কাছে মানুষ। আর সে জন্যেই আমার প্রিয় মানুষদের আমি

খালা-খালু বলে আনন্দ পাই।

আপনার তিন পুরুষ আগের এই খালা-খালু কি করতেন তা কি আপনি জানেন?

হয়তো রাজার বাড়িতে কোনো কাজ করতো।

হয়তো নয়, তিনি ছিলেন রাজার বাড়ির রাজশিল্পী।

বললেন আখতার আহমেদ চৌধুরী। তার হাতে আবার ম্যাগনিফাইং গ্লাস। সেটা দিয়ে ছবিটা দেখে তিনি বললেন, ভালো করে দেখলে দেখা যাবে ভদ্রলোকের হাতে একটা রঙের ব্রাশ রয়েছে।

আমার মনে হয় আখতার আহমেদ তুমি ঠিকই বলেছো। যেদিন ভূমিকম্প হয় সেদিন এই ভদ্রলোক বিদেশী ভদ্রমহিলার খুব কাছাকাছি ছিলেন। আর হয়তো আপনার খালাও সেখানে ছিলেন। এবং আজকে বলতে খুবই খারাপ লাগছে। তবে কথাটা সত্যি! ভূমিকম্পের ভয়ে যখন বিদেশী ভদ্রমহিলা একদিকে ছুটে যাচ্ছিলেন তখন হয়তো বিদেশী ভদ্রমহিলা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় আপনার তিন পুরুষ আগের খালা-খালু গয়নাগুলো খুলে রেখেছিলেন।

কি বলছেন তুমি? আপনি

আমি ঠিকই বলছি। আপনার পূর্বপুরুষ এই রকম চোর-ডাকাতই ছিল।

আমি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ছোটকাকু কোনো কারণে উত্তেজিত করে তুলতে চাইলেন। ব্যাপারটা এক সময় তাই হলো।

আমার পূর্বপুরুষ এই রকম কোনো জিনিস চুরি করেনি।

সেটা আপনি জানলেন কি করে?

আমি জানি।

বুঝতে পারলাম ছোটকাকু সত্যি সত্যি রাজা সাহেবকে উত্তেজিত করে ফেলেছে। উদ্দেশ্য রাজা সাহেবের মুখ থেকে কিছু না বলা কথা বের করা।

এগারো.

রাজাসাহেব দ্রুত ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিয়ে এলেন পুরনো দিনের একটা খেরো খাতা। মলাটটা এক সময় লাল ছিল। এখন বিবর্ণ ধূসর।

আমার কোনো এক পূর্বপুরুষ এই ডায়েরিটা লিখে গেছেন- আমি পড়েছি! ভূমিকম্পের পর আমার তিন পুরুষ আগের খালা আর খালু ঐ বিদেশী ভদ্রমহিলার প্রচুর সেবাযত্ন করেছিলেন। কারণ ভদ্রমহিলা প্রচন্ড ভয় পেয়েছিলেন। ভয় পাবার পর আমার তিন পুরুষ আগের খালা-খালু তার প্রচন্ড যত্ন নিয়েছিলেন। সেই সেবাযত্নের কারণে বিদেশী ভদ্রমহিলা উপহার হিসেবে এই গয়নার সেটটা আমার খালাকে দিয়ে গেছেন।

আপনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এই গয়নার সেটটা এখন কোথায়?

সেটা তো আমারও প্রশ্ন। আর বুঝতেই পারছেন এতো দামি গয়নার সেট আমাদের কাছে থাকলে এই অবস্থার নিশ্চয়ই পরিবর্তন ঘটতো।

এটা অবশ্য আমরাও বিশ্বাস করি। গয়নাটা আপনি সত্যি পাননি।

- আখতার তুমি খাতাটা পড়ে কোনো ক্লু পাও কি না দ্যাখো। তার আগে অবশ্যই তৃতীয় ছবিটা দেখা বাকি আছে।

ছোটকাকু তৃতীয় ছবিটা হাতে নিলেন। অদ্ভুত একটা ছবি। এক অংশ সাদা রঙ। আর এক অংশ সবুজ। সবুজের মধ্যে কিছু অংশ কালো। আর এই কালোর মধ্যে একটা লাল বিন্দু।

ম্যাগনিফাইং গ্লাসে ছবিটা পরীক্ষা করে আখতার আহমেদ চৌধুরী বললেন,

ছবিটা আঁকা হয়েছে ১৯১৪ সালে। আরো একটা অদ্ভুত জিনিস ছবিটার রয়েছে-

আখতার সাহেব বললেন, ছবিটার একটা নাম রয়েছে।

কি নাম?

ট্রেজার আইল্যান্ড!

ট্রেজার আইল্যান্ড! মানে গুপ্তধনের কোনো ব্যাপার রয়েছে।

এই গয়নার সেটটাই তো একটা গুপ্তধন।

তাহলে কি এই গয়নার সেটটা কোথায় রাখা আছে সেটার কি কোনো সূত্র এই ছবিতে রয়েছে?

থাকতে পারে।

শুধু আমি নয়। ঘরের উপস্থিত সবাই আমরা ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছি। নানা রঙ মাখা একটি ছবি। কি এমন সূত্র থাকতে পারে এই ছবিতে যা থেকে পাওয়া যাবে প্রায় একশ' বছর আগে হারিয়ে যাওয়া জিটেন পাথরের গয়নার সেটটা।

ছোটকাকু নিজেও যথেষ্ট চিন্তিত। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে বারবার ছবিটা দেখছেন। আখতার সাহেবের সঙ্গে নানা রকম কথা বলছেন। শেষ পর্যন্ত ছোটকাকু একটা কথা বললেন,

এই সাদা রঙটাকে আমরা যদি পানি ধরি, এই সবুজ রঙটাকে জঙ্গল আর এই কালো জায়গাটা কোনো শোকের চিহ্ন।

শোক মানে তুমি কি বলতে চাইছো? ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত রাজপ্রাসাদ।

ঠিক তাই-

আমরা বিধ্বস্ত রাজপ্রাসাদটা দেখেছিলাম সেটা নদীর পাড়ে, জঙ্গলের মধ্যে। নদীর পানি শাদা। জঙ্গলের গাছ সবুজ।

একদম মিলে যাচ্ছে ছোটকাকুর কিউয়ের সঙ্গে।

কিন্তু এই লাল রঙটা?

এই লাল রঙটা কেন? সেটাই আসলে গত দুই দিন ধরে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। হয়তো লাল রঙ দিয়ে বিশেষ কোনো জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না।

বিধ্বস্ত রাজপ্রাসাদের বাইরে কোনো কিছুই উল্লেখ করার মতো চোখে পড়েনি কারো। তবে ভাঙা একটা দেয়ালের ওপর ছোট একটা লোহার মূর্তি রয়েছে। এই ধরনের মূর্তি আমি ঢাকায় আশপাশের জমিদার বাড়িতে দেখেছি। বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন প্রহরী। মাথায় লাল শিরস্ত্রাণ। তবে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হলো, মূর্তিটা দেয়ালে উল্টো করে রাখা হয়েছে।

আখতার সাহেবের ধারণা, ভূমিকম্পের কারণে কিংবা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মূর্তিটা উল্টে গেছে।

জুলফিকার হাওলাদার মূর্তিটির মাথার শিরস্ত্রাণের রঙ লাল দেখে সেখানেও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির চেষ্টা করেছেন। এবং সেখানেও তেমন কিছু নেই।

পুরো ব্যাপারটাই এখন সবার জন্য ক্লান্তিকর। কিন্তু ছোটকাকু কিছুতেই হাল ছাড়তে রাজি নন। ভাঙা একটা পাথরের সিঁড়ির ওপর সেই যে বিকেলে বসেছেন ওঠার নাম নেই।

জুলফিকার হাওলাদার পুলিশদের দিয়ে চারটা হ্যাজাক বাতি নিয়ে এসেছে। সেগুলো চারদিকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই আলোতেই হঠাৎ করে চোখে পড়লো, ভূতের মতো একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরনে ধুতি-ফতুয়া। বয়স ষাটের কম নয়।

কি হারাণ বাঁশিঅলা কি খবর তোমার?

জুলফিকার হাওলাদার জিগ্যেস করলেন।

আজ পূর্ণিমার রাত। বড় বাঁশি বাজাতে ইচ্ছা করছে। তাই এখানে এলাম।

রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় লোকটা বলল।

কিন্তু আমরা যে একটা জরুরি কাজ

করছি এখানে। তাই আজ বাঁশি বাজানো যাবে না।

একটু মন খারাপ করে হারাণ বাঁশিঅলা আবার নদীর দিকে হাঁটা দেয়।

আমার কেমন যেন মায়া হলো লোকটার প্রতি।

ছোটকাকুকে বললাম,

একটা লোক বাঁশি বাজাতে চাচ্ছে। দেব?

ছোটকাকু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বা না কি বললেন বোঝা গেল না। কিন্তু আমি সেটাকে সম্মতির লক্ষণ মনে করে ওসি সাহেবকে বললাম,

এমনিতেই আমরা হতাশ হয়ে বসে আছি। একটু বাঁশির সুর শুনলে মন্দ কি?

ওসি সাহেব বললেন,

আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু আপনাদের কথা ভেবেই হারাণকে বাঁশি বাজাতে মানা করেছিলাম। হারাণ খুব ভালো বাঁশি বাজায়। আপনাদের ভালো লাগবে মাঝে মাঝে এই জঙ্গলে বসে। একা একা বাঁশি বাজায়।

জঙ্গলে বসে নয়, আমি বাঁশি বাজাই ঐ মূর্তিটার পাশে বসে।

হাওলাদারের ইঙ্গিতে ইতিমধ্যেই পুলিশেরা ডেকে নিয়ে এসেছে হারাণ বাঁশিঅলাকে। হারাণ বাঁশিঅলা উল্টো হয়ে যাওয়া বল্লম হাতে লোহার চৌকিদারের পাশে বসল। ঠোঁটে তুলে নিল বাঁশি। একদিকে আমি বসে আছি গাছগাছালির মধ্যে আর সামনে একটা রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। এর মধ্যে বাঁশির সুরেলা ধ্বনি। পুরো পরিবেশটা একেবারেই অন্যরকম হয়ে গেল।

কিন্তু ছোটকাকুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রাজাসাহেবের বাড়ি থেকে পাওয়া রঙিন ছবিটার দিকে। আমি জানি শুধু ছবিটার দিকে নয়, ছোটকাকু আসলে তাকিয়ে আছেন ছবির লাল রঙটার দিকে। কিসের চিহ্ন ওটা!

এরই মধ্যে আজ বিকেলে অন্য আরেকটা ব্যাপার ঘটেছিল। ছোটকাকু আর আখতার সাহেব একটা ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে এই ছবিটাতে সত্যি সত্যি ইঙ্গিত করা হয়েছে জেট পাথরের গয়নাটা কোথায় রাখা আছে। এটা মনে হওয়ার কারণ ছবিটা আঁকা হয়েছে ১৯১৪ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে। জাপানি বোমারু বিমানগুলো তখন আকাশে উড়ছে। সুতরাং তিন পুরুষ আগে রাজসাহেবের খালা-খালু এই দামি জিনিসগুলো লুকিয়ে ফেলেছিলেন রাজপ্রাসাদের এবং এটা নিশ্চিত ঘটনাটা যেহেতু ১১১৪তে তখন নিশ্চয়ই তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাসাদের বাইরেই কোথাও। কিন্তু সেটা কোথায়?

আমি জানি ছোটকাকু এই একটি কথাই ভাবছেন- আকাশের দিকে তাকালাম। পূর্ণিমার রাত আজ।

এতোক্ষণ চাঁদটা মেঘে ঢাকা ছিল। আস্তে আস্তে মেঘ সরে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই আমার মনে হলো রাতের বেলা কি আকাশে রঙধনু দেখা যায়? এখন ঠিক আমাদের মনের মধ্যে সাতরঙের যে খেলা চলছে তার সঙ্গে রঙধনু দেখা গেলে বেশ মজাই হতো।

এই কথা ভাবতেই হঠাৎ দেখি ছোটকাকু উঠে দাঁড়িয়েছেন। এগিয়ে যাচ্ছেন হারাণ বাঁশিঅলার দিকে। হারাণ বাঁশিঅলা এক মনে বাঁশি বাজাচ্ছেন। ছোটকাকুও তাকিয়ে আছেন একমনে। বললেন,

আমার মনে হয় জেট পাথরের গয়নাটা আমি খুঁজে পেয়েছি।

হারাণ বাঁশিঅলা কিছু বুঝলো না। কিন্তু আমরা সবাই উঠে কাকুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছোটকাকুর হাতে রহস্যময় সেই ছবিটা। ছবির পেছনে ঘুরিয়ে ছোটকাকু দেখালেন লেখা আছে-

পূর্ণিমার রাত। মেঘ সরে যাওয়ায় চাঁদের আলো এসে পড়েছে উল্টে যাওয়া মূর্তিটার ওপর। আর মূর্তিটার ছায়া পড়েছে সামনের মাটিতে। কিন্তু ছোটকাকু সেই ছায়াটার দিকে না গিয়ে বললেন,

মূর্তিটার পাশে দেখো, আরেকটা ছায়া পড়েছে। সেটার দিকে তাকালাম। মূর্তিটার পাশে আগে মনে হয়েছিল লোহার একটা মোটা রড দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ছায়ায় দেখতে পেলাম এই রডের মধ্যে একটা আকৃতি রয়েছে। সেই আকৃতিটা অনেকটা একটা সিন্দুকের মতো। নিচের দিকে রডটা যত সরু ওপর দিকে ততোটা নয়। বেশ মোটা। আর এই মোটা জায়গাটার উপরেই চাঁদের আলোয় যে ছায়াটা পড়েছে সেটাও কেমন যেন একটু লালচে রঙের। এর কারণ মূর্তিটার শিরস্ত্রাণের লাল আভাটা পড়েছে ঠিক জায়গায়।

বুঝতে অসুবিধা হলো না। উপরের এই মোটা অংশের মধ্যে আছে দামি গয়নার সেটটা। গোপন একটা ছোট্ট চাবির গর্ত দেখা গেল সেখানে। ১০০ বছর আগের এই অদ্ভুত বাক্স চাবি দিয়ে খুলতে খুব বেশি সময় দিলেন না ছোটকাকু।

একশ' বছর আগের একটা ছবিতে দেখেছিলাম গয়নার সেটটা। তারপর দেখেছিলাম দেয়ালে ঝোলানো ছবিতে। আর এখন দেখছি চোখের সামনে। এতো বছরের পুরনো গয়না। কিন্তু উজ্জ্বলতা হারায়নি একটুও। চাঁদের আলোয় চকচক করছে। বিশেষ করে হাতের আংটির বাঘটা। যেন তাকিয়ে আছে।

গয়নার সেটটা রাজাসাহেব নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন উত্তরসূরি হিসেবে। আর আখতার আহমেদ চৌধুরী গবেষণার কাজের জন্য রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দু'জনের আগ্রহেই বাদসাধলেন হাওলাদার, রংপুর সদর থানার ওসি। তিনি বললেন,

এটা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। আমার দায়িত্ব সরকারের মাধ্যমে কোনো জাদুঘরে এটা দিয়ে দেয়া। তবে একটা অনুরোধ করতে পারি, যে জাদুঘরে এটা থাকবে সেই জাদুঘরে আপনাদের নাম যেন লিখে রাখা হয়। ■

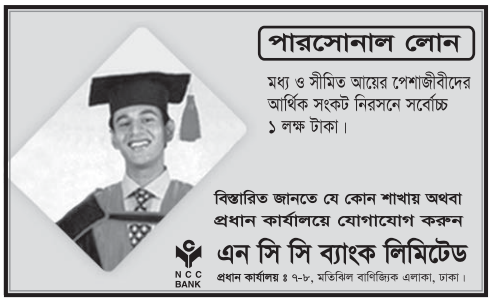

HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্য হ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাব।

TUKINA INTERNATIONAL
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukina.com